সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

সেপ্টেম্বর ২০১৫

মৃত্যুহীন প্রাণ...

১৫ আগস্ট ২০১৫ স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে ভারতীয় হাই কমিশন

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

www.hcidhaka.gov.in
Facebook page: /IndiaInBangladesh; @ihcdhaka
IGCC Facebook page: /IndiraGandhiCulturalCentre
Bharat Bichitra
Facebook page: /BharatBichitra

বর্ষ তেতাল্লিশ | সংখ্যা ০৯ | ভাদ্রআশ্বিন ১৪২২ | সেপ্টেম্বর ২০১৫

যোগের ইতিহাস ও আমার অভিজ্ঞতা

মহারাষ্ট্রের দেহু গ্রামে একদিন

সূচিপত্র

শ্রদ্ধাঞ্জলি: এ পি জে আব্দুল কালাম ০৪
মৃত্যুর অনুষঙ্গে মৃত্যুহীন রবীন্দ্রনাথ ০৬
যোগের ইতিহাস ও আমার অভিজ্ঞতা ০৯
মহারাষ্ট্রের দেহু গ্রামে একদিন ১২
ছোটগল্প: অচেনা আপন ১৮
কবিতা ২৪
সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় বুদ্ধিবৃত্তি ২৭
অনুবাদ গল্প: 'ইলুরে অবশ্যই আসছি' ৩৩
ধারাবাহিক: রূপকথা ভূতকথা ভালবাসা ৩৭
রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প ৪২
ত্রিপুরার বাচিক উৎসবে সৌহার্দের সুর ৪৬
শুভ্রা মুখোপাধ্যায় বাংলার অনন্য আত্মীয় ৪৮

০৪

মৃত্যুহীন প্রাণ...

ভারতের মহান রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালামের মহাপ্রয়াণে সান ইয়াৎ সেনের জন্য মাও সে তুং উচ্চারিত কথাগুলো আমার অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং যথাযথ মনে হয়েছে। মনে হয়েছে তাঁর মহাপ্রয়াণে সত্যি হিমালয় ভেঙে পড়েছে। তাঁর মৃত্যু ছিল অত্যন্ত আকস্মিক। এমনটি কেউ ধারণা করতে পারেননি। সুন্দর সুস্থ সদা কর্মচঞ্চল আব্দুল কালাম বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তের মেঘালয় রাজ্যের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের শহর শিলংয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মহাজ্ঞানী মহাজন কালাম এসেছিলেন তরুণ ছাত্রদের সমাবেশে বক্তৃতা দিতে। তিনি মঞ্চে বক্তৃতারত অবস্থায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে নিচে পড়ে যান। তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তিনি সেখানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স নূরন নাহার

মুদ্রণ গ্রাফোসম্যান রিপ্রোডাকশন এন্ড প্রিন্টিং লি.
৫৫/১ পুরানা পল্টন ঢাকা১০০০ ফোন ৯৫৫৪৮০৪

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩৭, ৯৮৮৮৭৮৯৯১ এ ক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৯০৯৯৮৮২৫৫ ৫, e-mail: informa@hcidhaka.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান১ ঢাকা১২১২

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

বিভিন্ন তথ্যে ভরপুর

আমরা ‘গীতা আলোচনা কেন্দ্র’এর সদস্য সদস্যাবৃন্দ নিয়মিত শ্রীমদ্ভগবদ গীতা পাঠ, আলোচনা এবং সনাতন ধর্মীয় শাস্ত্র গ্রন্থের আলোচনা করে থাকি। আপনাদের প্রকাশিত ভারত বাংলা দেশের সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ *ভারত বিচিত্রা* ভারতের পৌরাণিক ইতিহাস, মহান ব্যক্তিদের জীবনী, ধর্মীয় আলোচনাসহ বিভিন্ন তথ্যে ভরপুর থাকে যা আমাদের গীতা আলোচনা কেন্দ্রের সদস্য সদস্যাদের জানা দরকার।

আমরা যাতে নিয়মিত ভাবে আপনাদের প্রকাশিত ‘ভারত বিচিত্রা’ পত্রিকাটি পেতে পারি তাহার ব্যবস্থা করে বাধিত করবেন।

গীতাশাস্ত্রী মৃণালকান্তি পাল সভাপতি
গীতা আলোচনা কেন্দ্র, শ্রীশ্রীরাধা গোবিন্দ মন্দির
গ্রাম + ডাক গিলাতলা, থানা রামপাল
বাগেরহাট৯৩৪০

সেতুবন্ধ তৈরি করেছে

আমি *ভারত বিচিত্রার* একজন নিয়মিত পাঠক। বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ২য় বর্ষে পড়ছি। প্রায় তিনচার বছর ধ রে *ভারত বিচিত্রা* পড়ছি। এর গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণ প্রভৃতি আমার খুব ভাল লাগে। পত্রিকাটির মাধ্যমে ভারত তথা উপমহাদেশের সংস্কৃতিইতিহাসঐতিহ্য সম্পর্কে জানতে পারছি। *ভারত বিচিত্রা* দুই বাংলার মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করেছে।

আমার পক্ষে নিয়মিত *ভারত বিচিত্রা* পড়া একটু কষ্টকর। আমাকে কয়েক কিলোমিটার হেঁটে পাবলিক লাইব্রেরিতে গিয়ে ভারত বিচিত্রা পড়তে হয়। বিনামূল্যে পাঠকদের দেওয়ার জন্য সম্প্রতি *ভারত বিচিত্রায়* বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। নিয়মিত পাঠক হিসেবে আশা করি আমাকে পত্রিকাটি পাঠিয়ে পড়ার সুযোগ দিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

মো. আব্দুল জলিল আখন্দ
আখন্দ মঞ্জিল, বাসা নং ৩৯, ওয়ার্ড নং ৪
শান্তিবাগ, মৌলভী বাজার পৌরসভা
মৌলভীবাজার৩২০০

আগ্রহের কমতি নেই

আমি পিরোজপুর জেলার গাওখালী আইডিয়াল লাইব্রেরির সভাপতি। আমাদের লাইব্রেরিতে মাঝেমধ্যে এক বিশেষ মাধ্যমে আপনাদের *ভারত বিচিত্রা* পেয়ে থাকি। তারপর থেকে পত্রিকাটির বিশেষ চাহিদা বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য, আমাদের লাইব্রেরিতে আরও দুইতিনটা দৈনিক পত্রিকা রাখা হয়। তারপরও *ভারত বিচিত্রার* প্রতি পাঠকের আগ্রহের কমতি নেই। ব্যক্তিগতভাবে আমার ভ্রমণকাহিনি ও পর্যটনস্থানের বর্ণনা আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

অতএব, আমাদের সংগঠনকে নতুন গ্রাহক তালিকাভুক্ত করে পত্রিকা পাঠের সুযোগদানে বাধিত করবেন।

জুয়েল ম-ল সভাপতি
আইডিয়াল লাইব্রেরি
গাওখালী, নাজিরপুর
পিরোজপুর৮৫৪১

পড়তে চাই

আমি নব্বই দশকের প্রথম দিকে ‘সারুটিয়া প্রগতি সংঘ’এর সাধারণ স ম্পাদক থাকাকালীন আপনার সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ ভারত বিচিত্রার গ্রাহক হয়ে চারবছর নিয়মিতভাবে প্রতিটি সংখ্যা পড়তাম। সেইসঙ্গে ক্লাবের লাইব্রেরিও সমৃদ্ধ হয়েছে। বর্তমানে কারো কাছে *ভারত বিচিত্রার* কোন সংখ্যা পেলেই তা পড়ি। গত কয়েক দিন আগে হঠাৎ এপ্রিল ২০১৫ সংখ্যার মাধ্যমে জানতে পারলাম *ভারত বিচিত্রার* নতুন গ্রাহকদের নাম ঠিকানা অন্তর্ভুক্তির কাজ চলছে। আমি নিয়মিত *ভারত বিচিত্রা* পড়তে চাই।

মো. বাবলুর রহমান
উর্ধ্বতন সহকারী রেজিস্ট্রার অফিস
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়
কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ

দারুণ আগ্রহ

কুড়িগ্রাম জেলার অন্তর্গত নাগেশ্বরী উপজেলায় অবস্থিত পাগলা বাজার গ্রন্থাগারটি ইতোমধ্যে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর সাংস্কৃতিকবিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক তালিকাভুক্ত হয়েছে। গ্রন্থাগারটিতে প্রত্যহ অনেক পাঠকপাঠিকার সমাগম ঘটে। আপনার পত্রিকাটি পাঠক পাঠিকাদের কাছে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। প্রকৃতপক্ষে পত্রিকাটির মাধ্যমে ভারতের অনেক অজানা বিষয় জানা যায় বলে পাঠকদের পড়ার দারুণ আগ্রহ। ভারত বিচিত্রার সৌজন্য কপি পাঠালে পাঠকপাঠিকা এলাকাবাসী উপকৃত হবেন।

মো. জাহিদুল ইসলাম সভাপতি
গাগলা বাজার গ্রন্থাগার
নাগেশ্বরী, কুড়িগ্রাম

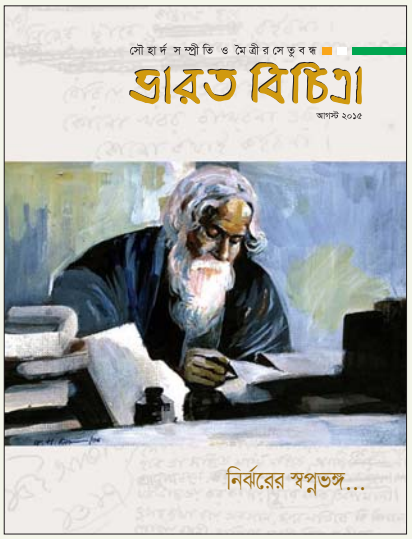

একান্ত প্রয়োজন

কর্মশেখা পাঠাগারটি যশোর জেলার অভয়নগর উপজেলার ৪নং পায়রা ইউনিয়নের বারান্দী গ্রামে অবস্থিত। পাঠাগারটিতে প্রতিদিন যে পরিমাণ পাঠকপাঠিকার সমাগম হয়, তার তুলনায় দৈনিক পত্রপত্রিকার সংখ্যা খুবই কম। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর যশোরের তালিকাভুক্ত এ পাঠাগারটি সদস্যদের মাসিক চাঁদা, ব্যক্তি অনুদান ও জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের অনুদানের ভিত্তিতে চলে।

এমতাবস্থায় কর্মশেখা পাঠাগারের পাঠক পাঠিকাদের জন্য *ভারত বিচিত্রার* সৌজন্য কপি পাঠাবার ব্যবস্থা করে আমাদের কৃতজ্ঞ করবেন।

মো. কামাল হোসেন সাধারণ সম্পাদক
কর্মশেখা পাঠাগার
অভয়নগর, যশোর

খুবই আগ্রহী

আমি পাইকগাছা উপজেলার পাইকগাছা কলেজের একজন নিয়মিত ছাত্র। ইতোপূর্বে আমি *ভারত বিচিত্রার* গ্রাহকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে পত্রিকাটি পড়েছি। এতে ভারতের বিভিন্ন দিক যেমন, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানের বর্ণনা থাকে। শুধু তাই নয়, ভারত বিচিত্রায় ভারতের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়ে থাকে, যা শুধু মনোগ্রাহী নয়, অত্যন্ত শিক্ষণীয়ও বটে। তাই আমি ভারত বিচিত্রার গ্রাহক হতে খুবই আগ্রহী। আমাকে ভারত বিচিত্রার নতুন গ্রাহক করে বাধিত করবেন।

মো. মাসুম বিল্লাহ
পিতা মো. আতিয়ার রহমান মোড়ল
গ্রাম গোপালপুর, ডাকঘর গদাইপুর
পাইকগাছা, খুলনা

সম্পাদকীয়

এবারের বর্ষাঋতু দীর্ঘতর হতে হতে আশ্বিনে এসে ঠেকল প্রায়– সারাদেশে, আরো বিশেষভাবে বললে হিমালয়সন্নিহিত সকল অঞ্চলে বন্যা হানা দিয়েছে কমবেশি। আর বন্যার অবশ্যম্ভাবী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় মানুষ, মনুষ্যেতর প্রাণি, জীবজন্তুগাছপালার সমূহ ক্ষতি সাধিত হয়েছে। বেড়ে গেছে কৃষিজাত প্রায় সকল পণ্যের দাম। বাংলাদেশের শস্যভাণ্ডার হিসেবে পরিচিত উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ এলাকা প্লাবিত হওয়ায় ফসলের খেতে কৃষকের হাহাকার রাজধানীর বাজারেও প্রভাব ফেলেছে।

দিনপঞ্জির পাতায় ভাদ্রআশি৺নের পরিচয় শরৎকাল হিসেবে লিপিবদ্ধ হলেও এখনও প্রকৃতিতে শরতের শিশির ধোয়া রূপটির দেখা মেলেনি– শিউলি কি ফুটেছে? গাছতলায় ঝরা শেফালির শুভ্রতা কি মনকে আবিষ্ট করতে পারছে? কী জানি কী হল প্রকৃতির! এমন অচেনা রূপে না জানি কোন্ বিপদের বার্তা ঘনিয়ে আসে! যদিও মা আসবেন বলে আমাদের মনে মনে আসন পেতে রেখেছি, তবুও এমন বাদলদিনে রোদ্দুব ৃষ্টির এমন কানাকানিতে মন উতলা হয়ে আছে। কী জানি কোন্ অজানা আশংকায় বিকল হয়ে আছে মন– কিছুতেই ভাল হচ্ছে না। শরতের প্রসন্নতার ছাপ এখনও পড়েনি প্রকৃতিতে। স্নিগ্ধরূপিণী জগদ্ধাত্রী তোমার অকালবোধন হোক– আমাদের ঘর থেকে, এই পলিমাটির সোনার দেশ থেকে তুমি সকল জরাজীর্ণতা, সকল ক্লীবত্বহীনতা, সকল হিংস্রা বিদ্বেষ, সকল বাধাবিঘ্ন দূর করে দাও। তোমার চির প্রসন্নতা ছড়িয়ে পড়ুক লোকায়ত বাংলার জনপদে– সবাই অভয় পাক।

এরকম এক বৃষ্টিধোয়া শরৎকালে বাংলার এক অখ্যাত গ্রামে জন্মেছিলেন এক বিখ্যাত সাহিত্যিক। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর নাম। ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন তিনি। বাবার হাতেই তাঁর লেখাপড়ার সূত্রপাত। বাবা ছিলেন প্রখ্যাত সংস্কৃত পণ্ডিত– পাণ্ডিত্য ও কথকতার জন্যে যিনি শাস্ত্রী উপাধি পেয়েছিলেন। কিন্তু অষ্টম শ্রেণিতে পাড়ার সময় বাবার মৃত্যু হলে বৃহৎ পরিবার নিয়ে বড্ড বিপাকে পড়ে যান এই কিশোর। নিদারুণ দারিদ্র্যও ছিল সংসারে কিন্তু তা পরীক্ষার ফলে প্রভাব ফেলতে পারেনি। বরাবর ভাল রেজাল্ট করে ১৯১৮ সালে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে ডিস্টিংশনসহ বিএ পাশ করেন বিভূতিভূষণ। এরপর তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় স্কুল শিক্ষকতা দিয়ে। অন্যান্য চাকরিও যে করেননি এমন নয়, তবে শিক্ষকতাই প্রধান। মিথ্যা বিজ্ঞাপন সত্য প্রমাণিত করতে হাতে কলম তুলে নেন তিনি– *প্রবাসী* পত্রিকায় 'উপেক্ষিতা' নামে গল্প লিখে সাড়া ফেলে দেন। ১৯২৫ সালে *পথের পাঁচালী* রচনা শুরু করেন। তিন বছরে শেষ হয়। এরপর লেখেন *অপরাজিত*। আমরা জানি, সকল কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টিই লেখকের ব্যক্তিগত জীবনকাহিনিনির্ভর। *পথের পাঁচালী*তেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। এই দু'টি উপন্যাসে তিনি প্রকারান্তরে নিজের জীবনকাহিনিই লিপিবদ্ধ করেছেন। অসামান্য কলমের জোর ছিল তাঁর। কিশোর উপন্যাস *চাঁদের পাহাড়* পড়লে চোখের সামনে শ্বাসরুদ্ধকর চলচ্চিত্র যেন প্রবাহিত হতে দেখি। এমন শক্তিমান লেখক কিন্তু দীর্ঘ জীবন পাননি– ১৯৫০ সালে মাত্র ৫৬ বছর বয়সে তিনি ইহধাম ত্যাগ করেন– রেখে যান অনবদ্য এক সাহিত্যজগৎ পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। যে বাঙালি পাঠক বিভূতিভূষণ পড়েননি, তাকে পাঠক বলে স্বীকার করা কঠিন। জীবনের এমন রূপ বর্ণনা বুঝি বিভূতিভূষণেই সম্ভব!

শ্রদ্ধাঞ্জলি

এ পি জে আব্দুল কালাম

একটি এলিজি

মাহবুবুর রহমান

কয়েক হাজার বছরের রাজতন্ত্রের পতন ঘটিয়ে আধুনিক গণতান্ত্রিক চিনের গোড়াপত্তন করেন মহান বিপ্লবী নেতা ডা. সান ইয়াৎ সেন। তাঁর মৃত্যুতে শ্রদ্ধা জানিয়ে গভীর অনুরাগী মাও সে তুং বলেছিলেন, 'মৃত্যু অতি স্বাভাবিক নিত্য ঘটনা, তা যেন পাখির পালক খসে পড়া, যেন গাছের শুষ্ক পাতা ঝরে পড়া। কিন্তু কিছু কিছু মৃত্যু আছে যা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দেয়, যেন থাই পর্বত ধসে পড়ে।'

ভারতের মহান রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালামের মহাপ্রয়াণে সান ইয়াৎ সেনের জন্য মাও সেতুং উচ্চারিত কথাগুলো আমার অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং যথাযথ মনে হয়েছে। মনে হয়েছে তাঁর মহাপ্রয়াণে সত্যি হিমালয় ভেঙে পড়েছে। তাঁর মৃত্যু ছিল অত্যন্ত আকস্মিক। এমনটি কেউ ধারণা করতে পারেননি। সুন্দর সুস্থ সদা কর্মচঞ্চল আব্দুল কালাম বাংলাদেশের উত্তর সীমান্তের মেঘালয় রাজ্যের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের শহর শিলংয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মহাজ্ঞানী মহাজন কালাম এসেছিলেন তরুণ ছাত্রদের সমাবেশে বক্তৃতা দিতে। তিনি মঞ্চে বক্তৃতারত অবস্থায় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে নিচে পড়ে যান। তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। তিনি সেখানে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

গোটা ভারতবর্ষের মানুষ তো বটেই, বাংলাদেশের মানুষ, এমনকি দক্ষিণ এশিয়ার মানুষ তাঁর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত হন; শোকে মুহ্যমান হন। এ যেন সত্যি হিমালয় ধসে যাওয়া এক মৃত্যু। আব্দুল কালাম বহুমাত্রিক প্রতিভার নানামুখী বিকাশের এক বিরল ব্যক্তিত্ব। তিনি জ্ঞানতাপস, বিজ্ঞানসাধক, পরমাণু গবেষক। মহাবিজ্ঞানী আব্দুল কালাম ভারতের নভোচারী মিসাইলম্যান। তিনি স্বপ্নদ্রষ্টা, যুগস্রষ্টা, দার্শনিক ও কবি। গভীর মানবতাবাদী শান্তিবাদী। রবি ঠাকুরের কথায়, তিনি 'সীমার মাঝে অসীম'।

কোন সীমারেখা আব্দুল কালামকে সীমাবদ্ধ করতে পারেনি। তিনি জীবনভর শুধু স্বপ্ন দেখেছেন, অনেক বড় বড় স্বপ্ন। স্বপ্ন দেখাই ছিল তাঁর মহত্ব ও বিশালত্ব। তিনি গোটা জাতিকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন। তিনি তরুণদের বলতেন 'তোমরা যা ঘুমের মধ্যে দেখ তা স্বপ্ন নয়। স্বপ্ন সেটাই, যা তোমাদের ঘুমাতে দেয় না।' আব্দুল কালামের স্বপ্ন আত্মজয়ের। তাঁর স্বপ্ন বিশ্বজয়ের, মহাকাশ জয়ের। স্বপ্নগুলো মানুষের অদম্য চেতনার, মানুষের সীমাহীন সম্ভাবনার বিকাশ সাধনের।

আমার সৌভাগ্য হয়েছিল বৈজ্ঞানিক আব্দুল কালামের সঙ্গে এক দুর্লভ সাক্ষাৎলাভের। সেটা ১৯৯৬ সালের শেষের দিকে কথা। আমি সেনাবাহিনি প্রধান। ভারতের সেনাপ্রধান জেনারেল শংকর রায়চৌধুরীর আমন্ত্রণে ভারত সফরে যাই। দিল্লির সাউথ ব্লক বাহিনিপ্রধানদের সঙ্গে বৈঠক করি। আই কে গুজরালের মন্ত্রিসভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মুলায়েম সিং যাদবের সঙ্গে আমার আনুষ্ঠানিক সাৰাৎ হয়। প্রতিরক্ষামন্ত্রী এক পর্যায়ে আব্দুল কালামের কথা উল্লেখ করেন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে তাঁর সহযোগিতার ইঙ্গিত দেন। আব্দুল কালামের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। মাথাভরা দীর্ঘকেশ সৌম্য শান্ত উদার ও বিনয়ী মানুষটির মধুর আচরণ আমাকে মুগ্ধ করে। তিনি আমাকে বলেন, 'শুনেছি আপনি সেনাবাহিনির ইঞ্জিনিয়ার কোরে কমিশনপ্রাপ্ত। নিজেও ইঞ্জিনিয়ার। ভারতে আমরা নিজেরাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটিয়ে সামরিক আধুনিকায়ন করছি। সেনাবাহিনির আধুনিকায়নে আপনারাও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কাজে লাগাতে পারেন। চাইলে আমরাও সহযোগিতা করতে পারি।' বাংলাদেশ সম্বন্ধে তাঁর অনেক কৌতূহল দেখেছিলাম। জ্ঞান বিজ্ঞানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অমূল্য অবদানের কথা উল্লেখ করে তিনি জগদীশচন্দ্র বসু ও সত্যেন বোসকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন। আমার মনে পড়ে তিনি আমাকে কয়েকটি ব্যক্তিগত পত্রও লিখেছিলেন। আমি আনন্দ সহকারে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সেগুলোর জবাব দিই। আমার মনে পড়ছে, সফর শেষের সন্ধ্যায় আমি ও আমার স্ত্রী নাগিনা আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতায় এগিয়ে আসা কিছু বিশিষ্ট ভারতীয় বন্ধুর সম্মানে দিল্লির এক অভিজাত হোটেলে নৈশভোজের আয়োজন করি। তিন বাহিনির প্রধানগণসহ জেনারেল জ্যাকব রাষ্ট্রদূত মুচকুন্দ দুবে ও আরো অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব উপস্থিত হয়েছিলেন। জেনারেল অরোরা অসুস্থ থাকায় তাঁর কন্যাকে পাঠিয়েছিলেন। সেই সন্ধ্যায় বিজ্ঞানী এ পি জে আব্দুল কালামও নৈশভোজে অংশ নিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছিলেন।

বিজ্ঞানব্রতী আব্দুল কালাম ভারতকে বিশ্বসভায় সম্মানিত করেছেন। আত্মবিশ্বাস ও শক্তি যুগিয়েছেন। ভারতকে প্রযুক্তিমনস্ক করেছেন; স্বপ্নবিভোর করেছেন; সৃজনশীলতায়, মননশীলতায় নতুন নতুন মাত্রা যোগ করেছেন; বিশ্বের প্রথম কাতারের দেশগুলির সঙ্গে ব্রাকেটভুক্ত করেছেন।

বৈজ্ঞানিক ও প্রকৌশলী স্বপ্নচারী সাধক আব্দুল কালাম রচিত আত্মজীবনীমূলক বই *উইংস অফ ফায়ার*-এর শেষ কয়েকটি লাইন এরকম, 'এই গল্প শেষ হবে আমার সঙ্গেই, যেহেতু পার্থিব কিছুই আমার নেই। আমি কোনও কিছুরই মালিক নই, কিছুই সৃষ্টি করিনি, অধিকারী নই কোনও কিছুর– না পরিবার, না পুত্র কন্যা।

I am well in this great land
Looking at its millions of boys and girls
To draw from me
The inexhaustible divinity
And spread His grace everywhere
As does the water drawn from a well.

আমার প্রপিতামহ আবুল, আমার পিতামহ পাকির, আমার পিতা জয়নুলাবেদিন এর ব্লাড লাইন হয়তো শেষ হবে আব্দুল কালাম (অকৃতদার) এ এসে। কিন্তু খোদার মহিমা কখনও থামবে না, যেহেতু তা চিরন্তন।'

না। রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালাম তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে মোটেই শেষ হয়ে যাননি। কখনও যাবেনও না, খোদার মহিমায় তিনি তাঁর অবিস্মরণীয় কৃতির মধ্য দিয়ে চির জাগরূক থাকবেন। চির জাগরূক থাকবেন বাংলাদেশের মানুষের মনেও। তিনি বাংলাদেশে একাধিকবার এসেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানগুলোতে, বিদগ্ধ বিভিন্ন সভা সমাবেশে মূল্যবান বক্তৃতা দিয়েছেন। ছাত্র ও যুব সমাজকে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা তুলে দিয়েছেন। বিশাল বিশাল স্বপ্ন দেখিয়েছেন।

এ পি জে আব্দুল কালামের মৃত্যু এক অবিস্মরণীয় মৃত্যু। তিনি কর্মের মধ্যেই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছেন। আমরা সামরিক বাহিনিতে এমন মৃত্যুকে বলি, to die with boots on। ইউনিফর্ম পরিহিত অবস্থায় সৈনিকের মৃত্যু। তাঁর মৃত্যু রণাঙ্গনে একজন বীরযোদ্ধার গৌরবোজ্জ্বল মৃত্যু। এ পি জে আব্দুল কালামের স্মৃতির প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা।

লে. জে. মাহবুবুর রহমান
অবসরপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান

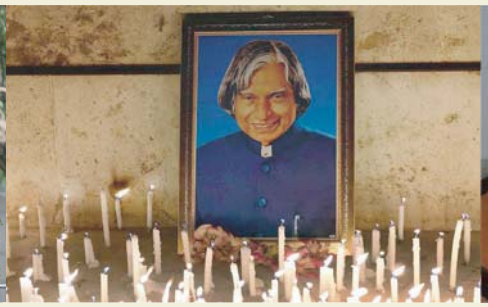

প্রবন্ধ

মৃত্যুর অনুষঙ্গে মৃত্যুহীন রবীন্দ্রনাথ

মথুরানাথ কু-

বাংলা ২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮, ইংরেজি ৭ আগস্ট ১৯৪১। প্রথম অ-ইউরোপীয় নোবেলজয়ী সাহিত্যিক, বাংলাভাষা সাহিত্য ও সাংস্কৃতির মধ্যাহ্নসূর্য, এক অতুলনীয় সারস্বত প্রতিভা অস্তমিত হল। কবি কাজী নজরুল ইসলামের কথায় আমরা 'রবিহারা' হলাম। এই দিনটিতে আমরা তাঁকে অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করি। তাঁকে নতুন স্মরণ করবার কোন অবকাশ নেই কেন-না তিনি কখনই অতীতের বা ইতিহাসের পাতায় আবদ্ধ হয়ে যাননি। তিনি সব সময়ে আমাদের সত্তায়, বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে আছেন। আমাদের সুখে-দুঃখে আনন্দ-বেদনায় মননে-দর্শনে জীবন-যাপনে তাঁর অমোঘ উপস্থিতি অনস্বীকার্য। ভারত, বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার জাতীয় সঙ্গীতে তিনি বর্তমান। বিদগ্ধ বুদ্ধদেব বসু যথার্থই বলেছেন যে, পাঠক ও জাতির জীবনে তাঁর মত দুর্মর প্রভাব কোন দেশের কোন লেখক কখনও করেছেন কিনা তা গবেষণার বিষয় হতে পারে।

যাঁরা ভাবছেন এটি স্রেফ বাঙালিসুলভ ভাবালুতামাত্র তাঁরা রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে অন্ন্রত তিনজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন কবির স্বতঃস্ফূর্ত, উচ্ছ্বাসময় অভিব্যক্তি পড়ে দেখতে পারেন। হ্যাঁ, আইরিশ কবি ইয়েটস, আমেরিকান কবি এজরা পাউন্ড এবং ফরাসি কবি আঁদ্রে জিদের কথাই বলছি। এঁরা সবাই কেবল অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁকে পড়েছেন যার মধ্যে মূল রচনার ভাষা ছন্দ এবং বর্ণনাতীত ব্যঞ্জনা একেবারেই অনুপস্থিত। কোলরিজ বলেছেন, ভাল একটি কবিতার কবিত্বময় ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ আংশটি কখনই অনুবাদের যোগ্য নয়।

আজকালকার কোন কোন উন্নাসিক লেখক প্রচার করছেন যে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের দর্শন দিয়ে ইউরোপের মন জয় করেছিলেন। বলাবাহুল্য, তাঁরা উপনিষদ পড়েননি বা বোঝেননি এবং মানসিক দূরত্বের কারণে রবীন্দ্রনাথের রস গ্রহণ করতে পারেননি। গীতাঞ্জলির কবির সঙ্গে উপনিষদের দর্শনের চেয়ে মরমীয়া কবি তথা বৈষ্ণব পদকারদের আত্মিক যোগাযোগ স্পষ্ট। তাছাড়া গভীর ব্যক্তিগত অনুভূতির সরল প্রকাশের প্রাবল্য তাঁকে সমস্ত মরমী পাঠকদের কাছেই বিশেষ আদরণীয় করে তোলে। যাদের মধ্যে ভাবের গভীরতা নেই, যথার্থ জীবনবোধ নেই, চেতনার প্রসারণ নেই তাদের মুখে রবীন্দ্রনাথের অকারণ অসাহিত্যিক বিরূপ সমালোচনা শোচনীয়ভাবে হাস্যকর।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও তাঁর কবিতার কেবল গদ্যময় ভাবানুবাদ করেছেন, কবিতারূপে অনুবাদের চেষ্টা করেননি। পরবর্তীকালে অনেক অক্ষম অকবি সেই ব্যর্থ প্রয়াস করেছেন।

সাধারণত কবিরা স্বল্পায়ু হন। শারীরিকভাবে বেঁচে থাকলেও তাঁদের আবেগ এবং কল্পনায় ভাটা পড়ে, কবিপ্রতিভার সমূহ হ্রাস হয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এর উলেখযোগ্য ব্যতিক্রম। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর অবয়ব উজ্জ্বলতর হয়েছে, তিনি সৌম্য দীপ্তিমান হয়েছেন এবং তাঁর সাংস্কৃতিক অবদান বর্দ্ধিষ্ণু হয়েছে। এমন কি, তিনি চিত্রশিল্পের মত একটি বলিষ্ঠ কলামাধ্যম গ্রহণ করেছেন প্রায় বৃদ্ধ বয়সেই। *গীতাঞ্জলি*পর্বের অনুপ্রেরণা, অন্বেষণ এবং সমর্পণ থেকে তাঁর কবিকৃতির মুক্তি ঘটেছে আলোয় আলোয়, সীমা থেকে অসীমে এবং সৃষ্টির বিচিত্র বৈচিত্র্যে। দেহত্যাগের মাত্র কয়েকদিন আগে তিনি তাঁর শেষ কবিতায় উচ্চারণ করলেন অবিস্মরণীয় অনুভব,

'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার ॥

কবি তখন রোগশয্যায়। দেখতে এলেন বিদগ্ধ লেখক বুদ্ধদেব বসু। নিষেধ সত্ত্বেও কবি বিছানায় উঠে বসলেন। কথা বলবার সময় তাঁর প্রতিটি বাক্যই রসাত্মক এবং সম্পূর্ণ। প্রতিটি শব্দের উচ্চারণ নিখুঁত এবং স্পষ্ট। বিস্মিত বুদ্ধদেব ভাবলেন তিনি এসেছেন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সম্রাটের কাছে। রোগ ও বার্ধক্য স্বীয় সাম্রাজ্যের উপর তাঁর দখল কিছুমাত্র কম করতে পারেনি।

সে সময়ে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার কেবল ইউরোপীয় ভাষার লেখকদেরই দেওয়া হত। রবীন্দ্রনাথের কবিতা তর্জমা *Song Offerings* প্রকাশিত হল ১৯১২ সালে লন্ডনে। বইটির দুর্বার আকর্ষণে প্রায় প্রতি মাসেই একটি করে সংস্করণ বের করতে বাধ্য হয় প্রকাশক ম্যাকমিলান কোং। ১৯১৩ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন ঔপন্যাসিক টমাস হার্ডি। ইংল্যান্ডের বিদগ্ধ সমাজ নোবেল একাডেমিকে জানায় অতুলনীয় কাব্য সংকলন *Song Offerings*এর কবি কে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নোবেল দেওয়ার কথা ভাবাই যায় না। এর পরের ঘটনা ইতিহাস। প্রথম ভারতীয় এশীয় এবং অইউ রোপীয় সাহিত্যিক হিসেবে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পেয়ে ইতিহাস রচনা করলেন। সমগ্র বাঙালি জাতি তথা ভারতবাসীর পৰে এই সম্মান অপ্রত্যাশিত অকল্পনীয় এবং অভাবনীয় ছিল।

আজকালকার কোন কোন উন্নাসিক লেখক প্রচার করছেন যে রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের দর্শন দিয়ে ইউরোপের মন জয় করেছিলেন। বলাবাহুল্য, তাঁরা উপনিষদ পড়েননি বা বোঝেননি এবং মানসিক দূরত্বের কারণে রবীন্দ্রনাথের রস গ্রহণ করতে পারেননি। *গীতাঞ্জলি*র কবির সঙ্গে উপনিষদের দর্শনের চেয়ে মরমীয়া কবি তথা বৈষ্ণব পদকারদের আত্মিক যোগাযোগ স্পষ্ট। তাছাড়া গভীর ব্যক্তিগত অনুভূতির সরল প্রকাশের প্রাবল্য তাঁকে সমস্ত মরমী পাঠকদের কাছেই বিশেষ আদরণীয় করে তোলে। যাদের মধ্যে ভাবের গভীরতা নেই, যথার্থ জীবনবোধ নেই, চেতনার প্রসারণ নেই তাদের মুখে রবীন্দ্রনাথের অকারণ অসাহিত্যিক বিরূপ সমালোচনা শোচনীয়ভাবে হাস্যকর। এই অবক্ষয়ের যুগে দুর্মূল্যের বাজারে নিজেদের বাজারদর বেড়ে যাওয়ায় তাদের মধ্যে প্রকৃত মূল্যবোধ গড়ে ওঠেনি।

সমস্ত জীবন কবি জীবনের জয়গান গেয়েছেন, বলেছেন, 'ব্যক্ত হোক জীবনের জয়।' চেয়েছেন, 'প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হরিয়ে, মোরে আরো আরো আরো দাও প্রাণ।' জীবন সম্বন্ধে তাঁর অবিস্মরণীয় উক্তি, 'কান পেতেছি, চোখ মেলেছি, ধরার বুকে প্রাণ ঢেলেছি, জানার মাঝে অজানারে করেছি সন্ধান।' এই জানার মাঝে অজানার সন্ধান করার অদম্য কৌতূহল থেকেই কবির মৃত্যুর প্রতি সহজাত কৌতূহল। কৈশোরের কাব্যপ্রয়াসে যখন তিনি *ভানুসিংহের পদাবলী* লেখেন তখনও তাঁর মধ্যে দেখি এই মৃত্যুর প্রতি আকর্ষণ,

'মরণ রে, তুঁহুঁ মম শ্যামসমান...
তুঁহুঁ মম মাধব, তুঁহুঁ, মম দোসর,
তুঁহুঁ মম তাপ ঘুচাও।
মরণ, তু আও রে আও।'

বলা ভাল, এই মৃত্যুপ্রেমের উচ্ছ্বাস কোন জীবনযন্ত্রণা থেকে উদ্ভুত নয়। তখন জীবন তাঁর সামনে সম্ভাবনাময়। নতুন এবং সুখসমৃদ্ধ।

পরবর্তীকালে তিনি মৃত্যু নিয়ে অজস্র লেখালেখি করেছেন যার মোদ্দা কথা হল,

'কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হতে সংশয়?'
জয় অজানার জয়।...
মরণকে তুই পর করেছিস ভাই,
জীবন যে তোর তুচ্ছ হল তাই।
দুদিক দিয়ে ঘেরা ঘরে তাইতে যদি এতই ধরে,
চিরদিনের আবাসখানা সেই কি শূন্যময়?'

তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়, 'জীবন আমার/ এত ভালোবাসি বলে হয়েছে প্রত্যয়/ মৃত্যুরে এমনি ভালো বাসিব নিশ্চয়।/ স্তন হতে তুলে নিলে কাঁদে শিশু ডরে– মুহূর্তে আশ্বাস পায় গিয়ে স্তনান্তরে।' তাই মৃত্যুর প্রতি কবি কখনই বিরূপ বা নিরুৎসাহ ছিলেন না।

এক দুর্বার ঐশী অনুপ্রেরণার বশবর্তী হয়ে তিনি কেবল অজস্র শিল্পসম্ভারই সৃষ্টি করেননি, রচনা করেছেন এক সৃষ্টিময় জীবনশৈলী যা সমাজজীবনের দৈনন্দিনতার মধ্য দিয়েও প্রবহমান থাকতে পারে। এটি সঞ্চার করবার জন্যই তাঁর বিশ্বভারতীর উদ্যম। তাঁর পাঠক হিসেবে আমাদের মধ্যেও এই জীবনশৈলী সঞ্চারিত হয়ে যায়। সবসময়েই আমরা তাঁর মধ্যে আশ্রয় খুঁজি, মুক্তি পাই, উজ্জীবিত হই। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যেকার সময়ে সভ্যতার সংকট এবং জীবনের নানা কুশ্রীতার মধ্যেও তিনি আমাদের মঙ্গলের বাণী শুনিয়েছেন, জনগণদুঃখনায়ককে, মঙ্গলদাতাকে আহ্বান করেছেন। আপাতদুঃখের মধ্যে জীবনের জয়ধ্বনি শুনিয়েছেন, 'বুঝি বা এই বজ্ররবে নূতন পথের বার্তা কবে– কোন পুরীতে গিয়ে তবে প্রভাত হবে রাতি।' সহজের মধ্যে ভুলে না থেকে জীবনের নানা কাঠিন্যের মধ্যে সত্যকে তিনি চিনে নিতে লিখেছেন,

'রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ–
চিনিলাম আপনারে
আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায়।'

এই দেখবার চোখ এবং হৃদয় তাঁর ছিল তাই তো তিনি রবীন্দ্রনাথ। এ যেন কবিতা নয় জীবনকে দেখা এবং দেখান কাব্যের রসায়নে।

মানুষের আসল আধ্যাত্মিক সত্তা সম্বন্ধে

তিনি স্থিরনিশ্চয় ছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন আমাদের মানুষী সত্তা কেবল স্রষ্টার সৃষ্টিবিলাসের জন্যই। জগতে আনন্দযজ্ঞে তাই আমাদের নিমন্ত্রণ। ঠিক এই কারণেই তিনি বলেছেন,

'বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি, সে আমার নয়।
অসংখ্য বন্ধনমাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ...
ইন্দ্রিয়ের দ্বার
রুদ্ধ করি যোগাসন, সে নহে আমার।'

এ কারণেই ইয়েটস লিখেছিলেন, 'He is the first among our saints who has not refused to live, but has spoken out of life itself, and that is why we give him our love.'

তবে জীবনের যাত্রাপথ তো ফুলে ফুলে ঢাকা নয়, কাঁটায় কাঁটায় পরিপূর্ণ। জাগতিক জীবনের সুখ জুবড়ে পড়ে থাকা তো প্রকৃত জীবন নয়, তাই তিনি আমাদের বহু বাসনায় বঞ্চিত করে কঠোর কৃপায় আমাদের জীবন ভরে রাখেন। কেননা দুঃখ তো কেবল দুঃখ নয়, দুঃখ থেকে দুঃখাতীতে উত্তরণের সোপানমাত্র। তাই তাঁর কবিতায় নেতিবাচক সুর নেই, তা সব সময় পরিপূর্ণ জীবনদর্শনে সদর্থক। তাই তাঁর লেখা আমাদের দুঃখকে সহন করবার উত্তরণের শক্তি যোগায় পরিশুদ্ধতায় ভরে তোলে।

বলাবাহুল্য, এটি কোন রোমান্টিক দুঃখবিলাস নয়। একেবারেই নয়। কবির ব্যক্তিগত জীবন মৃত্যুশোকে পরিপূর্ণ। শৈশবে তিনি মাতৃহীন, প্রথম যৌবনে বৌঠান কাদম্বরী দেবীর অসহনীয় আত্মহত্যা, মাত্র একচল্লিশ বছর বয়সে স্ত্রীবিয়োগ, একের পর এক পুত্র-কন্যার মৃত্যুর মিছিল। তাঁর স্পর্শকাতর মন এত দুঃখে কতটা বিচলিত হয়েছে তা সহজেই অনুমেয়। প্রিয় কনিষ্ঠপুত্র শমীন্দ্রনাথের মাত্র এগারো বছর বয়সে অকালমৃত্যুতে কবি সাধারণ মানুষের মত শোকে ভেঙে পড়েননি, অসীমের মধ্যে তার আত্মার চিরন্তন শান্তি কামনা করেছেন। মাত্র কয়েকদিন পরেই তিনি লেখেন, 'বিপুল তরঙ্গ রে, বিপুল তরঙ্গ রে।/ সব গগন উদ্‌বেলিয়া মগন করি অতীত অনাগত/ আলোকে উজ্জ্বল জীবনেচ ঞ্চল একি আনন্দ তরঙ্গ।' গানটিতে কোন বিষাদের চিহ্নমাত্র নেই। জীবনের অন্তহীন আনন্দের অপূর্ব অভিব্যক্তি আছে ভীমপলশ্রী রাগাশ্রয়ী এই অপূর্ব গানটিতে।

কোন উদাসীন অনুভূতিহীনতায় নয়, জীবনের অন্তহীন আনন্দের আস্বাদনেই তিনি গেয়েছেন,

'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যত দূরে আমি ধাই–
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু,
কোথা বিচ্ছেদ নাই।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ,
দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ
আপনার পানে চাই॥

অন্তরের সমস্ত গ্লানি, সংসারভার এক লহমায় দূর হয়ে যায় যখন আমরা সীমা ছেড়ে অসীমের মধ্যে অবগাহন করি। কবির কাছে জীবন এক আনন্দময় তীর্থযাত্রা। তা সুখময় না হলেও সদা আনন্দময়। তাই তো তিনি গাইতে পারেন,

'যাবার দিনে এই কথাটি/ বলে যেন যাই–/
যা দেখেছি, যা পেয়েছি তুলনা তার নাই...
পরশ যাঁরে যায় না করা/ সকল দেহে দিলেন ধরা। এইখানে শেষ করেন যদি/ শেষ করে দিন তাই।'

কালের অমোঘ নিয়মে যখন তিনি আর মর্তকায়ায় থাকবেন না, এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাবেন অন্যলোকে, কিন্তু সবকিছু যথারীতি চলতেই থাকবে তখন তাঁর জন্যে কি সব কিছু শেষ হয়ে যাবে? অনির্বচনীয় বিশ্বাসের সঙ্গে কবি গেয়েছেন,

'তখন কে বলে গো সেই প্রভাতে নেই আমি?
সকল খেলায় করবে খেলা এই আমি
নতুন নামে ডাকবে মোরে, বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি।'

কবির সীমাবদ্ধ ব্যক্তিচেতনা এখানে চিরন্তন সমষ্টিচেতনায় প্রসারিত। সে চেতনার অন্তহীন প্রবাহে কোন ছেদ নেই, তা বিধাতার সৃষ্টির মতই আদি অন্তহীন।

চেতনাময় এই মহাতীর্থযাত্রী কবির কোথায় মৃত্যু কোথায় বিচ্ছেদ কোথায় মহাপ্রয়াণ? বাইশে শ্রাবণে তাঁর মরদেহের তিরোধান কিন্তু তাঁর অনির্বাণ চেতনার শিখা আমাদের মধ্যে এবং তাঁর মৃত্যুহীন আত্মার মধ্যে অপ্রয়াণ।

মথুরানাথ কুণ্ডু
ভারতের প্রাবন্ধিক, যোগ অনুশীলনকারী

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

নতুন গ্রাহক অন্তর্ভুক্তি প্রসঙ্গে

আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ইতোমধ্যে *ভারত বিচিত্রার* অনলাইন এডিশনের সুবিধা চালু হয়ে গেছে এবং আপনারা অনলাইনে *ভারত বিচিত্রা* পড়ার সুযোগ পাচ্ছেন। এছাড়াও ফেসবুকে সংযুক্ত হতে পারেন। এই মুহূর্তে পত্রিকাটির নতুন গ্রাহকদের নামঠিকানা অ ন্তর্ভুক্তির কাজ চলছে। *ভারত বিচিত্রার* পুরনো ও নতুন গ্রাহকপাঠক দের অনেকেরই টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর/ ই-মেইল আইডি আমাদের কাছে নেই। যাঁরা নিয়মিত *ভারত বিচিত্রা* পড়তে ইচ্ছুক, এ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর অবিলম্বে নতুন গ্রাহক হিসেবে তালিকাভুক্ত হতে নাম, পদমর্যাদা (যদি থাকে), পূর্ণ ঠিকানা, টেলিফোন/ মোবাইল নম্বর, ই-মেইল আইডি (যদি থাকে) উলেখ করে সম্পাদক বরাবর চিঠি লিখে পাঠান। সবাইকে *ভারত বিচিত্রার* সঙ্গে সব সময় সংযুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই সংশোধিত নতুন তালিকা প্রস্তুতির এ আয়োজন।

ভারত বিচিত্রার পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধি, এর প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং একে আরও প্রাঞ্জল রূপ দেওয়াই আমাদের লক্ষ্য। আপনাদের প্রিয় পত্রিকায় ভ্রমণকাহিনি, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, গল্প, কবিতা, উপন্যাস প্রভৃতি লিখে পাঠাতে পারেন। লেখার কপি রেখে এবং ঠিকানা নির্ভুলভাবে লিখে পাঠাবেন। লেখা পাঠানোর ৬ মাসের মধ্যে মুদ্রিত না হলে বুঝতে হবে লেখা অমনোনীত হয়েছে। এ ব্যাপারে যে কোন ধরনের যোগাযোগ লেখকের অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।

– সম্পাদক

স্বাস্থ্য

যোগের ইতিহাস
ও আমার অভিজ্ঞতা

সাবিনা সিদ্দিক

ভারতীয় পুরাণ থেকে যোগ সম্পর্কিত অতি প্রাচীন যে গল্পটি জানা যায় তা হল– পৃথিবী একেবারে শুরুতে জলে পরিপূর্ণ ছিল আর ছিল অল্প কিছু দ্বীপ। সেই প্রাচীন সমুদ্রের এক দ্বীপের তীর ঘেঁষে সাঁতার কাটছিল এক মৎস্য। সে দেখতে পেল শিব তাঁর স্ত্রী পার্বতীকে যোগ শিক্ষা দিচ্ছেন। মৎস্য অবাক হয়ে শুনল শিব বলছেন, 'যোগ অর্জনে তিনটি ধাপ রয়েছে তবে লক্ষ্য একটিই। প্রথমটি হল, নিজের অহংকে শুদ্ধ করে অন্যের প্রয়োজনে কাজ করে যাওয়া কর্ম যোগ। দ্বিতীয়টি হল, জ্ঞান যোগ অর্থাৎ পবিত্র গ্রন্থ পাঠের মধ্যে দিয়ে জ্ঞানের চর্চা ও 'আমি কে' এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা। তৃতীয়টি হল, ভক্তিযোগ অর্থাৎ সকল কর্ম সেই একজন যিনি সকল কিছুর স্রষ্টা তাঁর প্রতি সমর্পণ করা। এই তিনটি ধাপের মাধ্যমেই নিজেকে আবিষ্কার করা সম্ভব এবং এর ফলেই নিজের ভিতরে পরম আত্মার উপস্থিতি উপলব্ধির মাধ্যমে নিজেকে পরম আত্মায় বিলীন করে দেওয়া সম্ভব।

সেই মৎস্য শিবের আশীর্বাদে মৎস্যরূপে মৎসান্দ্রা নাম অর্জন করে যোগের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। চতুর্দশ শতাব্দীর হঠ যোগ প্রদীপিকা গ্রন্থে মহর্ষি পতঞ্জলি এভাবেই মৎসান্দ্রাকে প্রথম যোগ শিক্ষক বলে উল্লেখ করেছেন। তবে বর্তমানে বিভিন্ন পণ্ডিত পতঞ্জলিকে Father of Yoga বলে থাকেন।

এর পর আর থেমে থাকেনি যোগের চর্চা। যুগে যুগে যোগী ঋষিগণ তাঁদের নিজের মত করে যোগকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং একসময় তা ছড়িয়ে দিয়েছেন মানুষের মাঝে।

এত গেল ইতিহাস। এখন যোগ কাকে বলে এই প্রশ্নের উত্তর বলা যায়, প্রতিটি প্রাণীর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য জরুরি হচ্ছে মহাজাগতিক সূক্ষ্মরশ্মির তরঙ্গ মাথার ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করে দেহমন কে জারিত করে হাত পায়ের মধ্যে দিয়ে বের হয়ে যাওয়া। এটি সুস্থ ও স্বাভাবিক লক্ষণ। কিন্তু বিভিন্ন অবস্থায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এই তরঙ্গ ছিন্ন হয়ে বিপরীত তরঙ্গে পরিণত হয় ফলে আকাশ হতে যে তরঙ্গ দেহের মধ্যে দিয়ে মাটিতে প্রবেশ করছিল তা মাটি হতে দেহের মধ্যে দিয়ে আকাশে যেতে থাকে। এখান থেকেই শুরু হয় আধি ও ব্যাধি।

কতগুলো বিশেষ ক্রিয়ার মাধ্যমে এই তরঙ্গকে নিম্নমুখী করা হয়। ঋষিগণ এই বিশেষ ক্রিয়াকে ৬৪ ভাগে ভাগ করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কতগুলো হল– আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম, ধ্যান, খাদ্যতত্ত্ব, জীবনযাত্রার আচারবিচার ইত্যাদি। এই ৬৪ ধারা অনুসরণ করে জীবনকে সঠিক পথে চালিত করাকেই যোগ বলা হয়। শুধুমাত্র আসনকে যোগ বলা ঠিক নয়। আসন যোগের একটি অংশমাত্র।

সৌভাগ্যক্রমে আমি আমার যোগ শিক্ষিকা আন্দ্রিয়া পাশার কাছ থেকে Scientific Yoga-এর ধারণা লাভ করি যা আমাকে পরবর্তীকালে একজন যোগ শিক্ষিকা হতে সাহায্য করেছে। যদিও শ্রেণী ভাগের সময় হঠ যোগের মধ্যে শুধুমাত্র আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম রয়েছে কিন্তু আমার শিক্ষিকা এতে ধ্যান সংযুক্ত করে এতে যেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন।

আমি আসন, মুদ্রা, প্রাণায়াম ও ধ্যানের সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর এর ফলাফল জানাচ্ছি।

আসন: প্রকৃতির স্বাভাবিক তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হয়ে মনুষ্যত্ব বিকাশের চৌষট্টি যৌগিক ধারার মধ্যে ১৭ নম্বর ধারা হল আসন। আসন অর্থাৎ আস্থান। আ শ ব্দের অর্থ সর্বত্র। স শব্দের অর্থ হল ঈশ্বর আর ন শব্দের অর্থ হল জ্ঞান। সর্বত্র ঈশ্বর জ্ঞান অর্থাৎ প্রতিকূলের প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উদার চেতনার হাতছানি। কিছু আসন যেমন, বৃক্ষাসন, মৎসান্দ্রাসন ইত্যাদি।

প্রতিটি প্রাণীর পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য জরুরি হচ্ছে মহাজাগতিক সূক্ষ্মরশ্মির তরঙ্গ মাথার ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে প্রবেশ করে দেহমন কে জারিত করে হাত পায়ের মধ্যে দিয়ে বের হয়ে যাওয়া। এটি সুস্থ ও স্বাভাবিক লক্ষণ। কিন্তু বিভিন্ন অবস্থায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে এই তরঙ্গ ছিন্ন হয়ে বিপরীত তরঙ্গে পরিণত হয় ফলে আকাশ হতে যে তরঙ্গ দেহের মধ্যে দিয়ে মাটিতে প্রবেশ করছিল তা মাটি হতে দেহের মধ্যে দিয়ে আকাশে যেতে থাকে। এখান থেকেই শুরু হয় আধি ও ব্যাধি।

মুদ্রা: মুদ্রা হল আসন ও প্রাণায়ামের মাঝামাঝি অবস্থান। মুদ্রার মধ্যে আসনের ভঙ্গি থাকে, পাশাপাশি প্রাণায়ামের কৌশলও থাকে। এই পুরো প্রস্তুতিটি ঘটে ধ্যানকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করার জন্য শারীরিক প্রস্তুতি। এ যেন শীত শেষে গ্রীষ্ম শুরু বা গ্রীষ্ম শেষে শীত শুরুর মাঝামাঝি– না শীত না গ্রীষ্ম অনুভূতি। যেন নতুন কঠিনকে ধীরে ধীরে সয়ে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। যেমন, উড্ডীয়ান মুদ্রা, অশ্বিনী মুদ্রা ইত্যাদি।

প্রাণায়াম: যে প্রক্রিয়ায় দেহের প্রাণশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং জরা, ব্যাধি ও অকালমৃত্যু থেকে দেহকে রক্ষা করে তারই নাম প্রাণায়াম। প্রাণের আয়াম অর্থাৎ প্রাণের দীর্ঘতাই প্রাণায়াম। যেমন ভ্রমণ প্রাণায়াম, শীতলী ইত্যাদি। বায়ু গ্রহণকে পূরক, ধারণকে কুম্ভক এবং ত্যাগকে রেচক বলা হয়। এই তিনটিই একসঙ্গে প্রাণায়াম।

ধ্যান: বিভিন্ন হস্ত মুদ্রা যেমন জ্ঞানমুদ্রা বায়ুমুদ্রা, শূন্যমুদ্রা, পৃথ্বীমুদ্রা, প্রাণমুদ্রা, অপানমুদ্রা, অপানবায়ুমুদ্রা, সূর্যমুদ্রা, বরুণমুদ্রা, লিঙ্গমুদ্রা এইসব দ্বারা শরীরে তৎক্ষণাৎ প্রভাব বিস্তার করা হয়। ধ্যানে বসে মুদ্রাবিজ্ঞান অনুযায়ী পাঁচ তত্ত্বের সমন্বয়ে শরীরের আভ্যন্তরগ্রন্থি অবয়ব এবং তাদের ক্রিয়াকে নিয়মিত করা এবং শরীরের সুপ্ত শক্তি জাগ্রত করে তোলা হয়। ধ্যান পরম আত্মার সঙ্গে মিলনের পথ তৈরি করে।

পরিশেষে বলতে চাই গত ১ মে ২০১৫ ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত যোগ সম্পর্কিত আলোচনা সভায় শ্রীমথুরানাথ কণ্ডু যে মূল্যবান বক্তব্য রেখেছেন তাতে আমি অত্যন্ত সমৃদ্ধ হয়েছি। তিনি কোন একটি ধারাকে আঁকড়ে না ধরে সকল নিয়ম ব্যক্তি তার ইচ্ছা ও ক্ষমতা অনুযায়ী অনুশীলন করতে পারেন বলে যে মতামত দিয়েছেন তারই অনুসরণ করে বলছি আসুন সকলে সারাদিন অন্তত এক ঘণ্টা যোগ অভ্যাস করি। শুরু করি এই ভাবে–

১. প্রথমে সূর্য নমস্কার করে নিই। সূর্য নমস্কারের ১২টি আসন আপনার শরীরকে প্রস্তুত করবে। এর পর হালকা কিছু আসন দিয়ে শুরু করি। শেষে শবাসন করে নিই।
২. মুদ্রা অভ্যাস করি কয়েক মিনিট যেমন উড্ডীয়ান।
৩. এর পর সহজ প্রাণায়াম কয়েকটি।
৪. সবশেষে ধ্যান।

এভাবে এক ঘণ্টা কাটানার পর নিজেকে অবশ্যই অনেক শান্ত, সুস্থ মনোযোগী ও ইতিবাচক হিসাবে আবিষ্কার করবেন।

সাবিনা সিদ্দিক
যোগ শিক্ষক

মুদ্রা হল আসন ও প্রাণায়ামের মাঝামাঝি অবস্থান। মুদ্রার মধ্যে আসনের ভঙ্গি থাকে, পাশাপাশি প্রাণায়ামের কৌশলও থাকে। যে প্রক্রিয়ায় দেহের প্রাণশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং জরা, ব্যাধি ও অকালমৃত্যু থেকে দেহকে রক্ষা করে তারই নাম প্রাণায়াম। ধ্যানে বসে মুদ্রাবিজ্ঞান অনুযায়ী পাঁচ তত্ত্বের সমন্বয়ে শরীরের আভ্যন্তরগ্রন্থি অবয়ব এবং তাদের ক্রিয়াকে নিয়মিত করা এবং শরীরের সুপ্ত শক্তি জাগ্রত করে তোলা হয়।

অভিজ্ঞতা

মহারাষ্ট্রের দেহু গ্রামে একদিন

হাসান হাফিজ

দেহু ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যের একটি গ্রামের নাম। সাধারণ পাঁচ-দশটা গ্রামের মত নয় দেহু। নানা কারণে মহাসড়কের পার্শ্ববর্তী এই গ্রামটি বিখ্যাত হয়েছে। এক কালের অখ্যাত এই গাঁয়ের সফলতার খবর ছড়িয়ে পড়েছে ভারতের বাইরেও। এই খ্যাতি ও স্বয়ম্ভরতা অর্জনে অবশ্য সময় লেগেছে বেশ। গ্রামবাসীকে পাড়ি দিতে হয়েছে দুর্গম পথ। সংস্কারে আচ্ছন্ন পশ্চাৎপদ দরিদ্র গ্রামবাসীকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, নিরন্তর লড়তে হয়েছে এতকালের লালিত প্রচলিত প্রথা, সনাতন ধ্যান-ধারণা, বদ্ধমূল ধারণা ও সংস্কারের সঙ্গে। স্বাস্থ্য ও পরিবেশবিষয়ক নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ত্যাগ-তিতিক্ষা– সেই সঙ্গে কঠোর অনুশীলনের পর্যায়, ধাপ, কষ্টকর চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এই গ্রামবাসী সর্বভারতীয় পর্যায়ে সম্মানজনক একটি অবস্থানে নিয়ে গেছেন নিজেদের ঠিকানাকে। পুণে শহর থেকে এই গ্রামটির দূরত্ব মাত্র ৩৫ কিলোমিটার। পুণে মহারাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা। ভারতের পশ্চিমভাগে মহারাষ্ট্রের অবস্থান।

দেহু গ্রামের প্রবীণ এক ডাক্তার রয়েছেন অভূতপূর্ব এই সুখ্যাতির মূলে। তাঁর অনলস শ্রম নিষ্ঠা কঠিন অধ্যবসায় ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মযজ্ঞের ফলেই অর্জিত হয়েছে দুর্লভ এই সম্মান। সমাজবদলের দৃঢ় অঙ্গীকার তাঁর মধ্যে ছিল বলেই অসাধ্যসাধন সম্ভবপর হয়েছে। তিনি এখন এই গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। সুদীর্ঘ ৪৭ বছরের নিরলস শ্রম ধৈর্য অধ্যবসায় এবং চেষ্টায় এই গ্রামকে তুলে এনেছেন পাদপ্রদীপের আলোয়। দেহু গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিদ্যমান অনন্য পরিবেশ সচেতনতা, স্বনির্ভরতার প্রয়াস ও তীব্র আকঙ্ক্ষা দেখে চমকে উঠতে হয়। যাঁকে ঘিরে এই খ্যাতির দ্যুতি ছড়িয়ে পড়া, ডা. এস ভি মাপুস্কর তাঁর নাম।

এখন ৭৫ বছর বয়সেও তিনি অক্লান্ত তারুণ্যে উদ্দীপিত কর্মযজ্ঞে ব্রতী এক অসামান্য সরল সাদামনের মানুষ। পরিবেশ সচেতনতা সৃষ্টির স্বীকৃতি হিসেবে তাঁর সংস্থা পেয়েছে ভারতের রাষ্ট্রীয় সম্মান। ভারতের রাষ্ট্রপতির হাত থেকে *নির্মল গ্রাম পুরস্কার* (২৫ লাখ ভারতীয় রূপি) গ্রহণ করেছে তার সংস্থা। এই সংস্থার নাম হচ্ছে *আপ্পা পটবর্ধন সাফাই পরিয়াবরণ তত্ত্ব নিকেতন*। হিন্দি পরিয়াবরণ শব্দটির অর্থ হচ্ছে পরিবেশ।

২০০৮ সালের ৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদল দেহু গ্রাম পরিদর্শন করে। ২১সদ স্যের এই প্রতিনিধিদলটির মহারাষ্ট্র সফরের উদ্যোগআ য়োজন ও বন্দোবস্ত করেছিল বিশ্ব ব্যাংক ঢাকা অফিসের ওয়াটার এ্যান্ড স্যানিটেশন প্রোগ্রাম (সাউথ এশিয়া)। ১ থেকে ৬ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের পুণে এলাকার বিভিন্ন স্থানে মোট চারটি গ্রামের পরিবেশগত অভূতপূর্ব সাফল্য পরিদর্শন ও নিবিড় পর্যবেক্ষণ করে এই প্রতিনিধি দল। এই সাফল্যকে কিভাবে বাংলাদেশেও কাজে লাগানো যায়, তা হাতেকলমে দেখা ও শেখা ছিল এ সফরের মূল উদ্দেশ্য।

বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার ইউনিয়ন পরিষদের নয়জন চেয়ারম্যান, একজন মহিলা মেম্বার, দু'জন ইউনিয়ন পরিষদ সচিব, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের একজন উপসচিব, একজন ইউএনও, বিশ্ব ব্যাংক ঢাকা অফিসের তিনজন কর্মকর্তা, তিনটি এনজিওর তিনজন কর্মকর্তা, একজন সাংবাদিক ছিলেন এই দলে। দলটির নেতৃত্ব দেন বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপসচিব শামসউদ্দিন আহমেদ।

প্রতিনিধিদলে ছিলেন সিরাজগঞ্জের তাড়াশ উপজেলার নওগাঁ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম গ্রহ, তাড়াশ সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মনসুর রহমান বাচ্চু, চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরের গোবরাতলা ইউপির চেয়ারম্যান আসজাদুর রহমান, দিনাজপুরের খানসামা উপজেলার গোয়ালডিহি ইউপির চেয়ারম্যান শাহাদাত হোসেন বাবলু, কুড়িগ্রামের রাজারহাট উপজেলার উমরমজিদ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবদুল হাকিম খন্দকার, গাজীপুর শ্রীপুরের গোসিঙ্গা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান নূর মোহাম্মদ ফকির, যশোরের চৌগাছা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এম এ সালাম, সাতৰীরার শ্যামনগর উপজেলার রমজান নগর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শেখ আলমগীর হায়দার (মরহুম), শ্যামনগর সদর ইউনিয়ন পরিষদের সচিব কাঞ্চনকুমার দে, কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার দেহুন্দা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবু তাহের ফকির তারু, করিমগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী অফিসার আতিকুর রহমান, করিমগঞ্জ দেহুন্দা ইউপির সচিব মশিউর রহমান বাবুল, করিমগঞ্জের গুজিদিয়া ইউপির মহিলা মেম্বার আসমা আক্তার, স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের উপসচিব শামসুদ্দিন আহমেদ, *ওয়াটার এইডএর* প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর ইমামুর রহমান, *ডাসকোর* সিইও আকরামুল হক, *পম্যান বাংলাদেশএর* সিনিয়র ডবি উএসএস স্পেশালিস্ট জিলুর রহমান, *বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরামের* (এফইজেবি) পক্ষে আমি, বিশ্ব ব্যাংক ডবিউ এসপি সাউথ এশিয়ার দু'জন সিনিয়র স্পেশালিস্ট শান্তনু লাহিড়ী ও মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান এবং বিশ্ব ব্যাংকের কনসালট্যান্ট আওলাদ হোসেন।

দেহু গ্রামের চালচিত্র

পুণে শহরের হোটেল প্রাইডে থাকতাম আমরা। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলা হয় পুণেকে। এই শহরের শিবাজী নগরের ইউনিভার্সিটি রোডে অবস্থিত পাঁচতারা হোটেল হচ্ছে 'প্রাইড'। ৪ সেপ্টেম্বর সকালে সেখান থেকে এসি বাসে দেহু যাত্রা। বাসের নামও বেশ বাহারি– গিরিকন্দ। গন্তব্যে পৌঁছতে আমাদের সময় লাগল ঘণ্টাখানেক। দেহু সমৃদ্ধ স্বনির্ভর গ্রাম। এই গাঁয়ের রাস্তাঘাট প্রায় সবই পাকা। দোকানপাট, বিপণী দেখে মনে হয় কোন গঞ্জে এসে পড়লাম বোধহয়। গ্রামের বাসিন্দাদের আর্থিক অবস্থা সচ্ছল বলেই মনে হয় আপাতদৃষ্টে।

ডা. মাপুস্করের আস্তানায় থামতে হল প্রথমে। তিনি তাঁর দীর্ঘকালের কর্মকাণ্ড সংবলিত ভিডিও দেখালেন প্রথমে। তারপর আমাদের নানাবিধ প্রশ্নের জবাব দিলেন। ওই ভিডিওতে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের নন্দিত তারকা মাধুরী দীক্ষিতকে পরিবেশ সচেতনতা বিশেষ করে স্যানিটেশনের ব্যাপারে মনোযোগী হওয়ার আবেদন জানাতে দেখলাম। মাধুরী মহারাষ্ট্রেরই গুণী মেয়ে। ডা. মাপুস্কর পরে তাঁর নিজ অফিসের প্রাঙ্গণে বিভিন্ন ধরনের স্যানিটারি ল্যাট্রিনের নমুনা দেখালেন। নানা প্রকার ল্যাট্রিনের বৈশিষ্ট্য, গঠন কৌশল, দরদামের প্রসঙ্গও তিনি সবিস্তারে তুলে ধরলেন তাঁর স্বভাবসুলভ সারল্য ও দক্ষতার সঙ্গে। দেহু গ্রামে শতকরা একশো ভাগ স্যানিটেশনসুবিধা নিশ্চিত করার দুঃসাধ্য, দীর্ঘ ও জটিল প্রক্রিয়া, এই লক্ষ্য অর্জনের বাধা বিপত্তি, অসহযোগিতা, মনুষ্য বিষ্ঠা থেকে কিভাবে বায়োগ্যাস তৈরি করা হয় তার প্রক্রিয়া প্রদর্শন প্রভৃতির খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করলেন। দেহু গ্রামের অনেক বাড়িতেই ল্যাট্রিন থেকে বায়োগ্যাস উৎপন্ন করা হচ্ছে। আমরা ঘুরে ঘুরে কয়েক বাড়িতে সেটা দেখেছিও। কথা বলেছি গৃহিণী, গেরস্তদের সঙ্গে।

ডা. মাপুস্করের অভিজ্ঞতা

তাঁর বাড়ি ছিল মুম্বইয়ে। এই গ্রামে কাজ করতে এসে মায়ার টানে বাঁধা পড়ে গেছেন। ফলে স্থায়ী ডেরা বেঁধেছেন এখানেই। তিনি আমাদের জানালেন, দ্রুত গতিতে ব্যাপক শিল্পায়ন হচ্ছে এখানে। তাছাড়া ধর্মীয় একটি তীর্থস্থান থাকায় প্রতিদিনই বহু মানুষের আগমন ঘটে নিত্যদিন। তুকারাম নামে এক পুণ্যাত্মার মন্দির রয়েছে এখানে। রোজই ভক্ত দর্শনার্থী আসে প্রচুর। জানা গেল, সেই সংখ্যা পাঁচশো থেকে এক হাজারের মত। ব্যাপক শিল্পায়ন প্রক্রিয়া চলছে। এর পাশাপাশি জায়গাটি তীর্থভূমি হওয়ার কারণে দেহু গ্রামে জনসংখ্যা বেড়ে চলেছে দ্রুত গতিতে।

গত শতাব্দীর ১৯৬০ সালে ডা. মাপুস্কর এখানে আসেন চাকরি

করার জন্যে। প্রাইমারি হেলথ সেন্টারের মেডিক্যাল অফিসার হিসেবে এই গ্রাম ছিল তাঁর কর্মস্থল। দীর্ঘকাল চাকরি করার পর স্বেচ্ছাঅবসর নিয়ে তিনি এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাসের সিদ্ধান্ত নেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলকে তিনি বলেন, আমি যখন এখানে আসি, তখন পানীয় জলের কোন ধরনের বন্দোবস্তই ছিল না। সারা গ্রামে পায়খানা ছিল না একটাও। আমি মুম্বইয়ের মানুষ– জন্ম ও বেড়ে ওঠা সেখানেই। নাগরিক সুযোগ সুবিধা ব্যবহার করে আমি অভ্যস্ত। এরকম একটা বিরুদ্ধ প্রতিকূল পরিবেশে এসে আমি বড় ধরনের ধাক্কা খেয়েছিলাম, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সেসব দিনের কথা ভাবলে এখন শিউরে উঠি। কী ভয়ঙ্কর সব দিনই না গেছে আমার জীবনে! পরিস্থিতিটা একটু কল্পনা করার চেষ্টা করুন আপনারা– এই গ্রামে পায়খানা নেই কোন বাড়িতেই। খোলা জায়গায় প্রথম দু'একদিন আমাকেও নিরুপায় হয়ে প্রাকৃতিক কাজকর্ম সারতে হল। এছাড়া কোন উপায় ছিল না। তৃতীয় দিন বিহিত হল একটা। নিজের জন্যে মাটিতে গর্ত করে ব্যবস্থা করতে হল।

নিত্যদিন আমার কাছে যেসব রোগী চিকিৎসা নিতে আসত, তাদের পরীক্ষানিরী ক্ষা করে কেস স্টাডি করে দেখলাম নিবিড়ভাবে। দেখলাম, মূলত দু'টি কারণে এরা অসুখবিসু খে ভুগছে। কারণ দু'টি হল– প্রথমত নিরাপদ পানীয়জল নেই এখানে। দ্বিতীয় সমস্যা– পায়খানা নেই কারো। অনেক ভেবেচিন্তে আমি এই সমস্যা সমাধানের উপায় বার করলাম। যে কোন মূল্যে এসব জটিল ও অবাঞ্ছিত সমস্যার মূলোৎপাটন করতে হবে। ডিসপেনসারিতে দৈনন্দিন কাজকর্ম করা, চাকরি সংক্রান্ত দায়দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি আমি এই সংকট নিরসনের ব্যাপারটিকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করলাম। সেই চ্যালেঞ্জ যে সুকঠিন, তাও জানতাম। কোনমতেই সহজসাধ্য কাজ ছিল না সেটা। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা যে কত জরুরি, সুস্থভাবে বেঁচে থাকবার পূর্বশর্ত, সেটা গ্রামবাসীকে বোঝানো শুরু করলাম। অনেক চেষ্টাচরিত্র করবার পর গ্রামের মাত্র দশটা পরিবার পায়খানা ব্যবহারে রাজি হল। এটা ৪৭ বছর আগেকার কথা।

ডা. মাপুস্কর তাঁর কষ্টার্জিত সাফল্যের কাহিনি বলে যেতে থাকেন। তিনি বলেন, ওই সময়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) অনুমোদিত পায়খানার একটি মডেল ছিল। ওই প্রযুক্তি অনুসরণ করে বানানো হল ১৯টি ল্যাট্রিন। প্রথম বর্ষাতেই সবগুলো গেল ভেঙেচুরে। হা ঈশ্বর! এ থেকে আমার স্পষ্ট একটা উপলব্ধি হল যে, বইয়ে যা লেখা থাকে, তার সবই বাস্তবে প্রযোজ্য হয় না। প্রথম নিরীক্ষাই ভেস্তে গেল আমার। ভীষণ হতাশ হলাম এতে। দেখা দিল আরেক বিপত্তি– যা ছিল খুবই অনভিপ্রেত ও অস্বস্তিকর। স্থানীয় লোকজন বেশ চটে গেল আমার ওপর। তারা বলল, খবরদার! ল্যাট্রিন নিয়ে তুমি কোন কথা বলতে আসবে না আমাদের কাছে। তোমার কথা শুনে আমরা পস্তাচ্ছি। এই বাজে সময় গেছে টানা চার বছর। ভাবুন দেখি, কী রকম অস্বস্তিকর পরিস্থিতি, কী বিপদেই না পড়েছিলাম আমি!

হার মানবার পাত্র তিনি নন। সমাজবদলের অগ্রদূত ডা. মাপুস্কর বললেন, বিকল্প কোন্ উপায়ে সামনে এগোনো যায়, সে সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করলাম। প্রত্যেকের স্টুল স্যাম্পল (মলের নমুনা) নিলাম। সেসব পরীক্ষা করানো হল ল্যাবরেটরিতে নিয়ে। সবাইকে আমি জানালাম, এসব মলে যদি কোন ধরনের জীবাণু পাওয়া যায়, তাহলে বিনিপয়সায় ওষুধ দেওয়া হবে। খোলা জায়গার মাটিও পরীক্ষা করা হল একই সঙ্গে। দেখা গেল, দেহু গ্রামের প্রত্যেক মানুষের মলে যেমন জীবাণু রয়েছে, তেমনি মাটিতেও রয়েছে ক্ষতিকর সব জীবাণুর দাপুটে ও ৰতিকর অস্তিত্ব।

সব মিলিয়ে ভয়াবহ এক অবস্থা! মাইক্রোস্কোপে আমি তাদের দেখালাম সেইসব ভয়ঙ্কর আগ্রাসী জীবাণুর ছড়াছড়ি। মানবদেহে বিপজ্জনক এসব জীবাণুর ক্ষতি করবার ৰমতা সম্পর্কে মানুষকে বিশদ বোঝালাম। লোকে ভীষণ অবাক হল দেখে। তাজ্জব হওয়াই কী শুধু? ভয়ঙ্কর জীবাণুপুঞ্জ দেখে বিস্মিত হওয়ার পাশাপাশি বেশ ভয়ও পেল তারা। এমন ভয় তারা আগে কখনও পায়নি। তারপর থেকে সচেতন হতে শুরু করল গাঁয়ের লোকেরা। এই সঙ্গে সূচিত হল দিনবদলের পালা।

স্বাস্থ্য সচেতনতাবিষয়ক প্রচার শুরু হল। সভা, মিছিলও হল এলাকায়। গণসমাবেশে যোগ দিলেন পাঁচশ'র মত লোক। সেই সমাবেশে সিদ্ধান্ত হল, আমি এই স্যানিটেশন অভিযানে নেতৃত্ব দেব না। ঠিক করা হল, নেতৃত্ব আসতে হবে স্থানীয় জনগণের মধ্য থেকেই। তা-ই বাঞ্ছনীয়। আখেরে সেটা অনেক কার্যকর ফল দেবে, আমি জানতাম। এটা গত শতকের ১৯৬৪ সালের ঘটনা। গ্রামবাসীদের আমি বললাম, আপনারা একটুও ঘাবড়াবেন না। আতঙ্কের কোন কারণ নেই। আমি নিজে ডিজাইন করে ল্যাট্রিন বানিয়ে দেব আপনাদের। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ওই সময়ে ভারতবর্ষে স্যানিটেশনবিষয়ক কোন কর্মসূচিই ছিল না আদতে। ভারত সরকারের মুখ্য কর্মসূচী ছিল দারিদ্র নিরসন সংক্রান্ত। তারপর ধুম লেগে গেল ল্যাট্রিন তৈরি করার। এক মাসে একশ' ল্যাট্রিন বানানো হয়ে গেল। এগুলো টু পিস ল্যাট্রিন। পট্টবর্ধন নামের এক ভদ্রলোক এটা উদ্ভাবন করেছিলেন। হুবহু তার মডেল নেয়া হয়নি। ওটা থেকে নিয়ে আমরা অন্য ধরনের একটা ল্যাট্রিন তৈরি করি। গ্রাম পঞ্চায়েতে কেরানির একটা পদ সৃষ্টি করা হল। গ্রামবাসীর কাছ থেকে ল্যাট্রিনের জন্যে টাকা সংগ্রহ করা ছিল তার মূল দায়িত্ব। ডা. মাপুস্কর বলে যেতে থাকেন– স্যানিটেশনের কার্যক্রমে ভারত সরকার সম্পৃক্ত হল আমাদের উদ্যোগেরও অনেক পরে, ১৯৮৬ সালে। অবশ্য, এর অনেক আগে থেকেই দেহু গ্রামের শতকরা ৭৫ ভাগ বাড়িতে ল্যাট্রিনের ব্যবহার শুরু হয়ে গিয়েছিল।

আমাদের প্রতিনিধিদলের সবাই হিন্দি বোঝেন না, বলতেও পারেন না। দু'চারজন যা পারেন, তা ভাঙা ভাঙা। ইংরেজিও সবার জন্য সহজে বোধগম্য নয়। সুতরাং পুরো ট্রিপে ভাষা একটা সমস্যা ছিল বৈকি! সেটা আমরা বিশেষ টের পাইনি শান্তনুদার বদৌলতে। বিশ্ব ব্যাংকের

ডবিউএসপির সিনিয়র স্পেশালিস্ট শান্তনু লাহিড়ীর কথা বলছি। তিনি সরল বাংলায় সব কথা সোজাসাপটা অনুবাদ করে দিয়েছেন। কী হিন্দি, কী ইংরেজি– সবই। শান্তনুদা ভারতীয় নাগরিক কিন্তু তাঁর পূর্বপুরুষের নিবাস ছিল আমাদের পাবনার তাঁতীবন্দ গ্রামে। সেখানে তাঁর পূর্বসূরীরা ছিলেন জমিদার। নাড়ি কিংবা শেকড়ের টান যাই বলি না কেন, শান্তনুদার মধ্যে সবসময়ই ক্রিয়াশীল দেখেছি। বাংলাদেশের জল-হাওয়া, মাটি, মানুষ এবং ঋদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ভালবাসার যে টান উপলব্ধি করেছি, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। পুণেতে তিনি আমাদের আগলে রেখেছিলেন। সেখানে ওঁর এক দিদির বাড়ির নেমন্তন্নও রক্ষা করতে পারেননি আমাদের দলকে সামাল দেওয়ার কাজে অহোরাত্রি ব্যস্ত থাকার কারণে। ভারতে বিদেশী নাগরিকদের মোবাইল ফোনের সংযোগ পাওয়া বড্ড কষ্টকর। আমরা বহু চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছি। অদ্ভুত ব্যাপার। রেশন কার্ড ছাড়া মোবাইল সিম মেলে না। শান্তনুদা আমাদের প্রায় সবাইকে তাঁর নিজস্ব মোবাইল ফোন ব্যবহার করতে দিয়েছেন অকাতর উদারতায়। একবার নয়, অনেকবার। সেটা এক খরচের ব্যাপার ছিল নিঃসন্দেহে।

যাক মূল প্রসঙ্গে ফিরে যাই। ডা. মাপুস্করের বয়স এখন ৭৫ বছর। এই বয়সেও তাঁর স্মৃতি দারুণ প্রখর। কত কাল আগেকার কথা। তবু দিনৰণ সবই তাঁর মুখস্ত। এই সমাজ সংস্কারকের কথা শুনলে মনে হয়, গতকাল কিংবা পরশু ঘটে যাওয়া কোন ঘটনার কথা বলছেন বুঝি! তাঁর মনোগ্রাহী বিবরণ শুনলে চোখের সামনে সেসব দিনের ছবি যেন ভেসে ওঠে। কঠিন ও দুঃসাহসিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে তাঁকে। সোনালি সেইসব দিনের অম্মধুর স্মৃতিপুঞ্জ হাতড়ে তিনি বলতে থাকেন, ১৯৮০ সালে আরেকটা প্রোগাম যুক্ত হল, তা হচ্ছে মনুষ্যবিষ্ঠা দিয়ে বায়োগ্যাস তৈরি করা। বুঝিয়েসুঝি য়ে তিনচারটি বাড়ির লোকদের রাজি করানো হল প্রথমটায়। তাদের মধ্যে সেই প্রণোদনা (Motivation) সৃষ্টি করবার কাজটি ছিল দুঃসাধ্য একটি কাজ। নিজস্ব পায়খানা দিয়ে গ্যাস তৈরি, তা দিয়ে আবার রান্নাবান্না করা– এটি অবলীলায় গ্রহণ করা বা মেনে নেওয়ার ব্যাপারটি কিন্তু খুব সহজ ছিল না। এই পরিবর্তন যারা মেনে নিলেন, তারা সাহসী ও পরিবর্তনকামী একথা বলতেই হবে। বিরাট মানসিক পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ এটি। তারপর এই বায়োগ্যাস প্রকল্প আরো প্রসারিত হয়। ১৯৮০ সাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত দেহুর ৭৫টি বাড়ি তে বায়োগ্যাস তৈরি ও ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারতবর্ষে এটাই অন্যতম একটি গ্রাম– যেখানে সবচেয়ে বেশি বায়োগ্যাস উৎপন্ন ও ব্যবহার করা হয়। পুরো গ্রামে একশো সিলিন্ডার গ্যাস সাশ্রয় হয় প্রতি মাসে। যত বেশি পরিমাণ পায়খানা করা হবে, বায়োগ্যাসও তত বেশি তৈরি হবে। সেজন্যে কেউ কেউ করছে কী, নিজ খরচে ল্যাট্রিন বানিয়ে প্রতিবেশীকে ব্যবহার করতে দিচ্ছে টাকার বিনিময়ে। বলছে, টাকা খরচ করে তোমাদের ল্যাট্রিন বানানোর কোন দরকার নেই। কিছু টাকা দাও– আমাদের ল্যাট্রিন ব্যবহার কর।

এই অঞ্চলের দিন বদলের অগ্রদূত মানবপ্রেমিক ত্যাগী ব্যক্তিত্ব ডা. এস ভি মাপুস্কর আমাদের জানান, তাঁদের এই গ্রামে রুরাল পাইপ সিস্টেম রয়েছে। নদীর পানি ট্রিটমেন্ট করে গ্রামবাসীকে দেওয়া হয়। পঞ্চায়েতে এখন লোকবল কম। ১৫ কর্মীর মধ্যে ১৩জনই স্যানিটেশন নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকে। এই গ্রামে আগে যখন লোকসংখ্যা কম ছিল, তখন ব্যবহৃত পানি নির্দিষ্ট একটি পুকুরে ফেলা হত। এখন সেই পুকুর নষ্ট হয়ে গেছে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটা বড় সমস্যা এই গ্রামের। গ্রাম পঞ্চায়েতের একটা ট্রাক্টর আছে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কাজ করা হয়ে থাকে সেটা দিয়ে। সমস্যা হল, আবর্জনার মধ্যে জৈব-অজৈবের মিশ্রণ থাকে। সেগুলোর ট্রিটমেন্টে ঝামেলা হয়। আলাদা আলাদাভাবে দুই ধরনের বর্জ্য ফেলতে পারলে সুবিধা হয়। বাড়তি সময় ও শ্রম লাগে না তাতে।

ভিডিও প্রদর্শনী শেষে ডা. মাপুস্কর আমাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সব সমাজেই এমন কিছু লোক আছে যারা ভাল কিছু বা পরিবর্তন পছন্দ করে না। আমি যে কাজে ব্রতী হয়েছিলাম, সে ধরনের সংস্কারমূলক কাজ করতে গেলে কিছু কিছু লোক খুঁত তো ধরবেই। সেটা সব দেশের সব সমাজেই কমবেশি আছে। আপনাকে দেখতে হবে, সেই সমালোচনার মধ্যে কোন ধরনের সত্যতা আছে কি না, থাকলে তা সংশোধন করে নেওয়া যেতে পারে। এছাড়া অন্যবিধ নিন্দা বা সমালোচনাকে পাত্তা দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

আপনি যে এই সমাজ সচেতনতা সৃষ্টির কাজ করছিলেন, আপনার উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সেটি কী চোখে দেখতেন? এই কাজ করার ব্যাপারে তাঁরা প্রতিবন্ধক ছিলেন কি না? একজনের এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, প্রথম দিকে সিনিয়র অফিসিয়ালরা অসন্তুষ্ট, বিরক্ত ছিলেন বৈকি! তবে সৌভাগ্যক্রমে আমি তাদের বিষয়টি ভাল করে বোঝাতে সৰম হয়েছিলাম। যে কাজ করতে আমি এসেছিলাম, সেটি মন দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে তো করতামই। এর অতিরিক্ত কাজ হিসেবে দিন বদলানোর এই কাজ করেছি। ভগবানকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই যে, আমার দীর্ঘ সাধনা প্রয়াস ও পরিশ্রম বৃথা যায়নি। কালক্রমে আমাদের কাজ অন্যেরা অনুসরণ করেছে এবং করছে। ভবিষ্যতেও হয়তো আরো করবে। মহারাষ্ট্র সরকারের বিভিন্ন কার্যক্রমে আমাদের সাফল্যের মডেল অনুসৃত হয়েছে, হচ্ছে। দীর্ঘ নিরলস সাধনা অর্থাৎ এই সুকঠিন কাজে লেগে থাকার জন্য বেশ কিছু উলেখযোগ্য স্বীকৃতিও মিলেছে। আমি পেয়েছি মহারাষ্ট্র রাজ্য সরকারের সবচেয়ে সম্মানজনক পুরস্কার 'স্বচ্ছতা দূত' সম্মাননা। ভারতের রাষ্ট্রপতির হাত থেকে আমার এনজিওর পৰে আমি গ্রহণ করেছি সর্বোচ্চ সম্মান *নির্মল গ্রাম পুরস্কার*।

তিনি জানান, দেহুতে শতকরা একশ'ভাগ স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। কিন্তু তারপরও সমস্যা আছে। তীর্থযাত্রীরা এলে সমস্যা সৃষ্টি হয়। বিপুলসংখ্যক ভাসমান মানুষের স্যানিটেশন সুবিধা নিশ্চিত করা বড় একটি সমস্যা। টাকা দিয়ে ল্যাট্রিন ব্যবহার করার সংস্কৃতি গ্রামে ঠিক চলে না। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, কোন ধরনের নতুন আইডিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা করা সময়সাপেক্ষ

বায়োগ্যাসসংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে ডা. মাপুস্কর বলেন, দৈনিক এক সিএফটি বায়োগ্যাস উৎপাদন করার জন্য ২৫জনের বিষ্ঠা দরকার। পাঁচজনের বিষ্ঠা দিয়ে একজনের রান্নার উপযোগী গ্যাস উৎপন্ন করা যায়। একজনের রান্না করতে লাগে এক ঘনফুট গ্যাসের এক পঞ্চমাংশ। আর, একটি বায়োগ্যাস পান্ট তৈরিতে খরচ পড়ে ১০ থেকে ১৫ হাজার ভারতীয় রুপি। ডা. মাপুস্কর আমাদের আরো জানালেন, তাঁদের উদ্ভাবিত সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখন একটি দু'টি নয় মোট ২৫টি প্রতিষ্ঠান অনুসরণ করছে। ডা. মাপুস্করের বাড়ির প্রশস্ত আঙিনা নানা মডেলের ল্যাট্রিনে পরিপূর্ণ। একেকটা একেক রকম। বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ, আকৃতি, গড়ন, ব্যয় ভিন্ন ভিন্ন। প্রদর্শনীর জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে এসব ল্যাট্রিন।

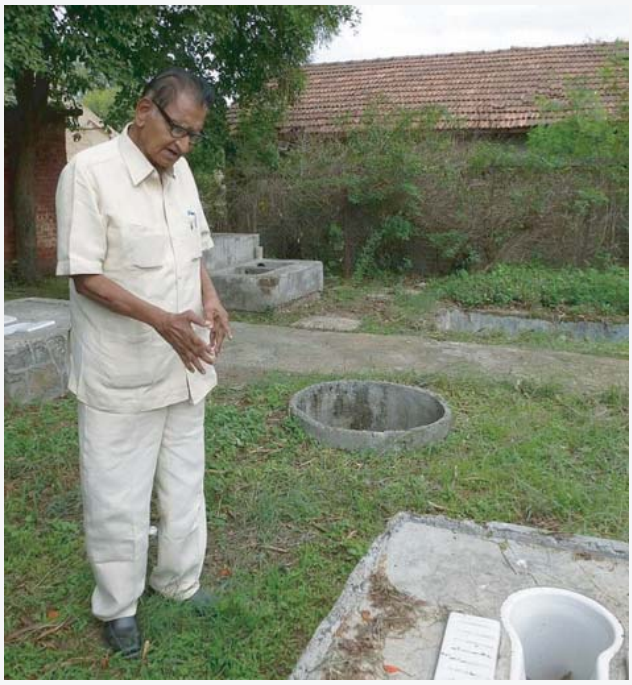

ব্যাপার। তা গ্রহণ করতে জনগণ সময় নেয়। ধারণা পরিষ্কার করা গেলে, প্রদর্শন করে দেখাতে পারলে কাজটা সহজ হয়। গ্রামবাসী তখন সেটা মেনে নেয়।

বায়োগ্যাসসংক্রান্ত এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, দৈনিক এক সিএফটি বায়োগ্যাস উৎপাদন করার জন্য ২৫জনের বিষ্ঠা দরকার। পাঁচজনের বিষ্ঠা দিয়ে একজনের রান্নার উপযোগী গ্যাস উৎপন্ন করা যায়। একজনের রান্না করতে লাগে এক ঘনফুট গ্যাসের এক পঞ্চমাংশ। আর, একটি বায়োগ্যাস পান্ট তৈরিতে খরচ পড়ে ১০ থেকে ১৫ হাজার ভারতীয় রুপি। ডা. মাপুস্কর আমাদের আরো জানালেন, তাঁদের উদ্ভাবিত সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখন একটি দু'টি নয় মোট ২৫টি প্রতিষ্ঠান অনুসরণ করছে।

বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের পক্ষে দলনেতা উপসচিব শামসউদ্দিন আহমেদ ডা. মাপুস্করকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। এরপর মাপুস্কর তাঁর বাড়ির আঙিনায় রক্ষিত বিভিন্ন ধরনের ল্যাট্রিনের নমুনা, বায়োগ্যাস প্যান্ট দেখালেন, ব্যাখ্যা করলেন। আমাদের দলের সঙ্গে গ্রামের বিভিন্ন বাড়িতে ঘুরলেনও। বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের যাঁরা ইউপি চেয়ারম্যান, তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন সব। প্রশ্ন করে জেনে নিলেন অনেক কিছু। নিজেদের দেশে ফিরে তাঁরা এসব প্রচলনে উদ্যোগী হবেন। সে জন্যে ছাত্রের মত শিক্ষা গ্রহণ করলেন। খুঁটিনাটি বারবার জেনে নিলেন। ডা. মাপুস্করের বাড়ির প্রশস্ত আঙিনা নানা মডেলের ল্যাট্রিনে পরিপূর্ণ। একেকটা একেক রকম। বৈশিষ্ট্য, গুণাগুণ, আকৃতি, গড়ন, ব্যয় ভিন্ন ভিন্ন। প্রদর্শনীর জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে এসব ল্যাট্রিন। আমাদের দলের একজন সেখানকার একটি ল্যাট্রিন ব্যবহারের অনুমতি চেয়েছিলেন। অনুমতি মেলেনি। ডা. মাপুস্কর তাঁর বাড়িতেই অন্যত্র অবস্থিত ল্যাট্রিন ব্যবহারের জন্য অনুরোধ জানালেন সবিনয়ে।

মহাসড়কের অন্যপাশে দেহু গ্রামের দু'টি বাড়িতে যাই আমরা। এক বাড়িতে লোকসংখ্যা দশ। তাদের বাড়িতে রান্নার জন্যে এলপিজি আছে, আছে বায়োগ্যাসও। আলাপচারিতায় বাড়ির গৃহিণী জানালেন, বায়োগ্যাস পান্ট করার আগে একটা গ্যাস সিলিন্ডারে চলত তিন সপ্তাহ। এখন চলে দুই থেকে তিন মাসের মত। বায়োগ্যাস থাকায় এলপিজি অনেক কম লাগে। ফলে খরচ বেঁচে যাচ্ছে অনেক। এখন থেকে ১৫ বছর আগে বসানো হয়েছিল এই পান্ট। তখন খরচ পড়েছিল দশ হাজার টাকা। অবাক হয়ে শুনলাম– এই যে বায়োগ্যাস তৈরি হচ্ছে, তা নাকি দোতলা/ তিনতলায়ও উঠে যায়। গ্যাসের চাপ এমনই প্রবল। ডা. এস ভি মাপুস্কর বললেন, কোন কারণে হয়তো বক হয়ে যেতে পারে ট্যাঙ্ক। তাহলে ক্যাপ আছে, সেটা খুলে ট্যাংক পরিষ্কার করার বন্দোবস্ত রয়েছে। তরল অংশটা চলে যাচ্ছে ড্রেনে।

মহাপ্রাণ এই চিকিৎসক তথা সমাজসংস্কারকের সান্নিধ্য পাওয়া গৌরবের ব্যাপার, আনন্দদায়ক এক অভিজ্ঞতা। সাধারণ মানুষের মঙ্গল ও কল্যাণে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁর আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও সম্মান পাওয়া উচিত।

হাসান হাফিজ কবি ও সাংবাদিক
সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ পরিবেশ সাংবাদিক ফোরাম

প্রশিক্ষণ

ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ভারত সরকার ২০১৪১৫ অর্থ বছরে ভারতীয় কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা (ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো অপারেশন্নআইটিইসি) কর্ম সূচির আওতায় প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রস্তাব দিচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৪৮টি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে এসব কোর্সের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিষয় যেমন– একাউন্টিং, টেলিযোগাযোগ, ইংরেজি, ব্যবস্থাপনা, গ্রামোন্নয়ন ও অন্যান্য বিশেষায়িত কারিগরি কোর্স। ভারত সরকার ৩৬ মা সের সংৰিপ্ত ও মাঝারি মেয়াদি এসব কোর্সের ব্যয়ভার বহন করে।

যোগ্যতা

আবেদনকারীর বয়স ২৫৪৫ বছ রের মধ্যে হবে এবং সরকারি বেসরকারি বিশেষায়িত কোর্সের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, স্বনামধন্য কর্পোরেট হাউস বা বাণিজ্যিক সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এ কোর্সে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ইংরেজির ব্যবহারিক জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

কিভাবে আবেদন করবেন

আবেদনকারীরা কর্মরত সংস্থার সুপারিশপত্রসহ আবেদনপত্র ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকায় পাঠাবেন। সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিকে অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। কোর্সের বিস্তারিত বিবরণ এবং আবেদনপত্র নিম্নলিখিত লিঙ্ক থেকে পাওয়া যাবে:

http://itec.mea.gov.in/?pdf2980?000
http://itec.mea.gov.in/?pdf1325?000

লিঙ্কগুলো ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট www.hcidhaka.gov.in-এর Education & Training সেকশনেও পাওয়া যাচ্ছে।

যে কোন তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন:
fscom@hcidhaka.gov.in

Training Programme in India

The Government of India offers the training courses under the India Technical and Economic Cooperation (ITEC) programme for the year 2014-15. The courses include diverse subjects such as Accounting, Telecommunication, English, Management, Rural Development and other specialized technical courses in over 48 reputed Institutions across India. They are typically short and medium term courses of between 3-6 months duration and are completely sponsored by the Government of India.

Eligibility

The applicants must be between 25-45 years of age and should have 5 years' relevant work experience in the area of specialized course in either Government or in a private organisation. They may belong to Government, Universities, reputed corporate houses or trade bodies. Working knowledge of English is essential.

How to apply

The applicants should forward their applications to the High Commission of India, Dhaka along with a letter of recommendation from the parent organisation of the applicant. Applicants working in the Government must approach the Economic Relations Division (ERD), Ministry of Finance or the Ministry of Foreign Affairs of the Government of Bangladesh for recommending the applications. The details of courses on offer for the year and application forms can be downloaded at the following links :-

http://itec.mea.gov.in/?pdf2980?000

http://itec.mea.gov.in/?pdf1325?000

The links are also available at the website of the High Commission of India at www.hcidhaka.gov.in under the Education & Training section.
Any queries may be addressed to
fscom@hcidhaka.gov.in

ছোটগল্প

অচেনা আপন

ঋতা বসু

মিলি

আজ সুহিতার বিয়ে। অজিতা প্রমিতারা ছেলেমেয়ে নিয়ে আগেই এসে গিয়েছে। আজ দুজনেরই স্বামীরা এসে পৌঁছবে। ভাগ্যিস আজ রাতে বাসরজাগা ইত্যাদির জন্য শোয়ার পাট বড় একটা থাকবে না, নয়তো কাজের বাড়িতে এতগুলো লোকের শোয়ার ব্যবস্থা করা সহজ হত না। তাছাড়া আমি যে ব্যবস্থাই করি না কেন এ বাড়িতে কারওই সেটা পছন্দ হয় না। বিমল অবশ্য বলে সেটা আমার আত্মবিশ্বাসের অভাব। সেটা যে খুব একটা ভুল নয় তা আমিও জানি, নয়তো সামান্য একটা ডাল রান্না করতে তিনবার চাখি নুন ঠিক হয়েছে কি না দেখতে! ঠিকই বলে বিমল। আজ বাড়িতে বিয়ে। কী সাজব, কেমন চুল বাঁধব– সেসব না ভেবে নন্দাইদের শোয়ার ব্যবস্থার কথা ভেবে আকুল হচ্ছি।

আজ সারাদিনই তেমন গায়েগত রে খেটে করবার মত কাজ নেই। বিমল আমার কথা ভেবেই খরচ বেশি পড়বে জেনেও সকালের জলখাবার থেকেই কেটারিংয়ের ব্যবস্থা করেছে। তবুও কেন যে আমারই এত টেনশন হয়! কেটারার রান্না খারাপ করলেও যেন সেটা আমারই দোষ। অথচ বিমল ও সুবু কেমন নিশ্চিন্তে পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। এই অতিরিক্ত টেনশন করেই সুবু হবার পর আমার ওই মারাত্মক নার্ভের অসুখটা হয়েছিল। স্কুলের চাকরি আর বিমলের

সব মিলিয়ে মানসিকভাবে আমি সত্যিই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আমি কোনওকালেই লড়াকু ছিলাম না। হাসিখুশি হুল্লোড়ে বলেই নাম ছিল। জোর করে দাবি আদায় করবার কথা চিন্তাও করিনি কোনওদিন। অবশ্য ক্লিবা দেখেছিলাম জীবনের! দাদা আমি মা বাবা– চারজনের সংসারে ম্লাই ছি লেন চালিকাশক্তি। বুদ্ধি এবং ব্যক্তিত্বে আমি মায়ের ধারেকাছেও যাই না। মা কিন্তু চেয়েছিলেন আমার আগেই সুহিতার বিয়ে হোক। মা কি যষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে টের পেয়েছিলেন আমার বিবাহিত জীবনে অন্যতম যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়াবে সুহিতা! দিনের পর দিন শাশুড়ির সঙ্গে মিলে সুহিতা যে মানসিক যন্ত্রণা আমাকে দিয়েছে তা বলার নয়।

জন্যেই শুধু বেঁচে গিয়েছিলাম। এসব কথা কিছুতেই বলা যায় না। আর বলবই বা কাকে! মা হঠাৎ চলে গেলেন বিয়ের চার মাসের মধ্যে। সেই শোক, আর বিয়ের সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃসত্ত্বা হবার অপরাধবোধ, শাশুড়ির কঠিন নির্দয় ব্যবহার, ননদ সুহিতা ও দেওর কমলের অবুঝ আচরণ–

সব মিলিয়ে মানসিকভাবে আমি সত্যিই বিপর্যস্ব হয়ে পড়েছিলাম। আমি কোনওকালেই লড়াকু ছিলাম না। হাসিখুশি হুল্লোড়ে বলেই নাম ছিল। জোর করে দাবি আদায় করবার কথা চিন্তাও করিনি কোনওদিন। অবশ্য ক্লিবা দেখেছিলাম জীবনের! দাদা আমি মা বাবা– চারজনের সংসারে ম্লাই ছি লেন চালিকাশক্তি। বুদ্ধি এবং ব্যক্তিত্বে আমি মায়ের ধারেকাছেও যাই না। মা কিন্তু চেয়েছিলেন আমার আগেই সুহিতার বিয়ে হোক। মা কি যষ্ঠেন্দ্রিয় দিয়ে টের পেয়েছিলেন আমার বিবাহিত জীবনে অন্যতম যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়াবে সুহিতা! দিনের পর দিন শাশুড়ির সঙ্গে মিলে সুহিতা যে মানসিক যন্ত্রণা আমাকে দিয়েছে তা বলার নয়। দুটো টিউশন ও পাড়ার নার্সারি স্কুলে পড়িয়ে সুহিতা যত শাড়ি ও শখের জিনিস কিনেছে আমার চার বছরের চাকরি জীবনে আমি তার অর্ধেকও করিনি। তাও তো আমি পড়াই নামকরা হাইস্কুলে, যেখানে মাইনেপত্র মোটামুটি ভালই। বাড়িতেও সুহিতাকে কুটোটি নাড়তে হয় না। অবাধ স্বাধীনতা, অগাধ প্রশ্রয়! তবু কেন যে ওর এত জ্বালা ছিল! হতে পারে, চোখের সামনে আমার ও বিমলের দাম্পত্যজীবন ওর মনে হতাশা ও তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল। তবু তো বিমলের আমার প্রতি ব্যবহার যথেষ্ট সংযত এবং আমিও দেখানেপনায় বিশ্বাসী নই। সপ্তাহান্তে বন্ধুদের বাড়িটাড়ি যাওয়া ছাড়া কখনওসখনও সি নেমা দেখা। এই তো চরম আমোদ।

কখনও বাইরে খেলেও বাড়ির রান্না পুরো করে গিয়েছি। নিজেরা যাচ্ছি সেই অপরাধবোধ থেকে সেদিন বাড়িতে ভাল রাঁধবারও চেষ্টা করেছি। তবু যখনই বেড়িয়ে ফিরেছি মনে হয়েছে মায়ের চাউনি যেন বেশি কঠিন; কমল যেন অতিরিক্ত গম্ভীর। সুহিতা যেন হঠাৎ ঘর গোছাতে বেশি ব্যস্ত। কোনওদিন দূরে কোথাও বেড়াতে পর্যন্ব যাইনি আমরা। অবশ্য নানাদিক থেকেই তা সম্ভবও ছিল না। একটিমাত্র ঠিকে ঝি সম্বল করে সংসার চালানো– ভোরবেলা উঠে রান্না শেষ করে সংসারের টুকিটাকি কাজ সেরে সাড়ে আটটার মধ্যে স্কুলে পৌঁছুনো। আবার চারটে নাগাদ ফিরে এসে দেখতাম মা এবং সুহিতা আমি এলে চা হবে তার অপেক্ষায় আছে। খানিকটা বাদে কমল আসবে আগুনের মত ৰিদে নিয়ে। তার ভরপেট খাবার চাই। তারপরেই রাতের রান্নার জোগাড় ইত্যাদি।

আমি হয়তো হাসিমুখেই সব কাজ করতাম যদি এরা আরেকটু সহানুভূতিসম্পন্ন হত। যদি না এদের দাবি বাধ্যতামূলক হত। যদি না এরা প্রাপ্য প্রাপ্তির ফারাকটা এমনভাবে গুলিয়ে ফেলত।

শুধু বিমলের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তবু বিমলই, সুবু হবার পর, যখন আমার নার্ভের অসুখটা হল, বলেছিল– চল আমরা এবার থেকে আলাদা থাকি। আমার খুব লোভ হয়েছিল। তা সত্ত্বেও নিজেকে সংযত করেছিলাম। আমাদের রোজগার এত বেশি নয় যে দুটি সংসার আলাদা করে চালানো সম্ভব হবে। কমল সেই বছরই চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি পাস করে দারম্নণ ভাল চাকরি নিয়ে চলে গেল গৌহাটি। আর এখন তো সুহিতাও চলে যাচ্ছে। আজ শুভদিনে উচিত নয় পুরনো কথা পুরনো দুঃখ মনে পুষে রাখা। সুহিতা সুখী হোক নতুন জীবনে সেই কামনাই করি।

বিমল

খানিকটা আগে সুহিতা ও অজয় চলে গেল। ওদের বাড়ি থেকেই নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। কল্যাণীতে অজয়দের বাড়ি। মা বাবা দাদা বউদি– বেশ ভরভরন্ত সংসার। আমার তো বেশ লেগেছে। মায়ের অবশ্য আপত্তি ছিল এত লোকের সংসারে মেয়ের বিয়ে দেওয়ায়। এত লোক–। ভাবলেও হাসি পায়; অন্য বাড়ির মেয়েও এসেছে আমাদের এত লোকের সংসারে, তখন তো মনে হয়নি বেশি লোক মানেই বেশি দায়িত্ব কর্তব্য।

অজিতপ্প মিতারাও গেল, কমলও। ওদের বাড়ির গাড়িতে। ফিরে আসবে ট্রেনে। আমাকেও অজিত একবার মৃদুভাবে বলেছিল, দাদা যাবি নাকি? বলার মধ্যে তেমন আন্ৰরিকতা ছিল না। তাছাড়া আমার ইচ্ছেও হয়নি। গত কয়েকদিন ধরে যথেষ্ট খাটাখাটনি গিয়েছে। ইচ্ছে করছিল ফাঁকা বাড়িতে খানিকক্ষণ মিলির পাশে বসি। সে আর হল না। বরকনে বিদায় নিতেই মিলি এবং আশেপাশে ফ্ল্যাটের আরও কয়েকজন মিলে তত্ত্ব সাজাতে বসেছে।

আমার কেমন ক্লান্ত লাগছে। হয়তো এই কয়েকদিন স্নায়ু অতিরিক্ত টান হয়েছিল। বাবার এই একটাই কাজ ছিল, তা শেষ হয়েছে। আমার তো তৃপ্তিবোধ করারই কথা; তবে কোথায় যেন একটা খিঁচ, একটা তিক্ততা কাঁটার মত বিঁধছে। সুহিতারা যাবার আগে আত্মীয়স্বজন পাড়া প্রতিবেশী কয়েকজন এসেছিলেন। আশীর্বাদপর্ব শেষ হল। আমি ও মিলি ধানদূর্বা দিয়েই আশীর্বাদ করলাম। আলাদা করে কিছু যে দিতে হবে তা মনেই হয়নি, কারণ সুহিতার নামে বাবার রেখে যাওয়া ওই মাত্র পঁচিশ হাজারে যে এমন বিয়ে হয় না এ তো জানা কথাই।

মিলি কিন্তু আমাকে আগেই বলেছিল– দেখ, কমল অত সুন্দর নেকলেস দিয়েছে আর আমরা নাম করে কিছু দিলাম না ঠিক কথা হবে। আমি হেসে উড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু আজ কমলের দেওয়া গয়নাটা নিয়ে সকলের বাড়াবাড়ি রকমের উচ্ছ্বাস দেখে আমার মনে একটা কূট সন্দেহ জাগছে। মা কি কারওকে বলেননি যে বিয়ের সিংহভাগ খরচ আমিই জুগিয়েছি! তার ওপরে আলাদা করে কোনও উপহার কেনা আর সত্যিই সম্ভব ছিল না।

আমি অবশ্য চিরকালই মায়ের এমন ব্যবহার দেখে আসছি। মিলি প্রথম প্রথম রাগ করত। বলত কমল কি দেবতা! সি এ যেন আর কেউ পড়ে না? তোমার মা এমন করেন যেন কমলের মত ছেলে ভূভার তে হয় না। দেখ, কমলের কাছ থেকেই একদিন এমন ধাক্কা খাবেন!
কে কী পাবে বা হবে জানি না তবে কমল যে নিজেরটুকু ছাড়া কোনও সাংসারিক দায়িত্ব নেবে না এটা ঠিক, নয়তো এই এক বছরে আর কারওকে না হোক নিদেনপৰে মাকে একবার নিয়ে যেতে পারত ওর গৌহাটির সাজানো গোছানো বাংলোতে।

সুহিতা ও কমল দুজনেই মায়ের অতিরিক্ত আদরে ও প্রশ্রয়ে কেমন যেন স্বার্থপর ও অবুঝ হয়ে উঠেছে অন্য কারও দিকটা ওরা ভাবতেই চায় না। কী জানি হয়তো নিজেদের সংসার হলে ঠিক হয়ে যাবে।

বাবাকে ওরা দুজনেই তেমন ঘনিষ্ঠভাবে পায়নি। বাবা যখন মারা

যান কমলের তখন পনেরো আর সুহিতার দশ বছর বয়স। সেই বয়সে বিপর্যয় বুঝবার মত মানসিকতা ওদের ছিল না।

কি আশ্চর্য। আমার মনে হচ্ছে, কমল তখন খুবই ছোট অথচ আমি কিন্তু ওই সময় থেকেই বাবার ব্যবসার কাজে সাহায্য করতাম। পড়াশুনোয় কমলের মত মাথা আমার ছিল না, আবার একেবারে ভোঁতাও ছিলাম না। মাঝারি গোছের রেজাল্ট হত সবসময়ে। পড়াশুনোর ফাঁকে ফাঁকে চায়ের নমুনা নিয়ে এজেন্টদের সঙ্গে দেখা করতাম। ছাপাতার নিলা মে যেতাম বাবার সঙ্গে। লাভ হত মোটামুটি কিন্তু খাটতে হত প্রচুর। বাবার একলার পক্ষে সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল না। আমি থাকতে বাবার খুবই সাহায্য হত।

মায়ের কিন্তু খুব একটা পছন্দ হত না আমার এই ব্যবসা নিয়ে মাথা ঘামানো। কলকাতার এই অভিজাত পাড়ায় আমাদের বহুতল বাড়িতে আমার বয়েসি ছেলেরা টেনিস, সাঁতার, গিটার, কুইজ ইত্যাদিতে সময় কাটাবে এটাই স্বাভাবিক ছিল। প্রতিবেশীদের সঙ্গে হয়তো এইসব নিয়ে মায়ের কথাও হত। মা কী ভেবে মনের জোর পেতেন জানি না। আমি প্রচণ্ড নিরাপত্তার অভাবে ভুগতাম ওই বয়স থেকেই। বাবার অবর্তমানে কী হবে ভেবেই শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যেত। মায়ের নামে কেনা এই ফ্ল্যাটটা ও সামান্য কিছু লগ্নি করা টাকা ছাড়া বলার মত আমাদের কিছু ছিল না। বি কম পাস করার সঙ্গে সঙ্গেই বাবা গত হলেন। আমি ততদিনে নানা লোকের সঙ্গে মিশে বাজার দেখে বিনা মূলধনে রোজগারের উপায় হিসেবে এল আই সি, ইউনিট ট্রাস্ট ইত্যাদির এজেন্ট হিসেবে কাজ শুরু করে দিয়েছি। শুধু এই কারণেই আমাদের সংসারটা ভেসে গেল না। বাবার পাওনা কিছু টাকার সঙ্গে আমার রোজগার জুড়ে যাওয়ায় সংসারের ঠাটবাট সবই আগের মত বজায় রইল। কমল ও সুহিতার গায়ে আঁচটুকুও লাগল না।

মা সংসারিক মোটা বিষয় ছাড়া আমার সঙ্গে খুব একটা কথা বলেন না– অবশ্য বলার মত আছেই বা কি! আমি বরাবরই খুব সাধারণ– সব দিক দিয়েই। কমলের মত তুখোড় বুদ্ধি, উজ্জ্বল চেহারা নেই আমার। তাছাড়া নানা বিষয়েই ওর অগাধ পড়াশোনা। গানবাজনা ছবি ইত্যাদির ভাল সমঝদারও। আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে ওই শ্রেষ্ঠ সব দিক দিয়ে। কমলকে নিয়ে মায়ের মনে যথেষ্ট গর্ব আছে।

আমার মনে হয় ছোটবেলা থেকে এই অতিরিক্ত আদর ও মনোযোগই সুহিতা ও কমলকে একটু স্বার্থপর করে তুলেছে।

মায়ের যে জন্য আমাকে অতি সাধারণ নিরুত্তাপ ও ভোঁতা বলে মনে হয়, মিলির মায়ের আবার সেই কারণেই আমাকে অত্যন্ত পরিণত ও নির্ভরযোগ্য বলে মনে হয়েছিল। একই বাড়ির বাসিন্দা হিসেবে মিলিকে তো ছোটবেলা থেকেই জানি। নববর্ষ ও পুজোর ফাংশনে ও সবসময়েই গানের দলে থাকত। মনে মনে ওকে পছন্দ করলেও আগ বাড়িয়ে বলার কথা ভাবিনি। কবেই বা আর নিজের দাবি বা চাহিদার কথা মুখ ফুটে বললাম!

মিলির মা অত্যন্ত সজাগ মনের মহিলা ছিলেন। আমার আচরণে কিছু বুঝে থাকবেন। এমনিতে ওঁদের সঙ্গে হৃদ্যতা ছিলই। এক সময়ে ওঁরা নিজেরাই আমাদের বাড়িতে প্রস্তাব দিলেন। মিলির দাদা এল আমেরিকা থেকে। সাধারণভাবে বেই বিয়ে হয়ে গেল আমাদের। আমার জীবনে একটা যথার্থ খুশির কারণ ঘটল এতদিনে। ওঁদের একমাত্র মেয়ে হিসেবে মিলির হয়তো আরও একটু ভাল বিয়ে হতে পারত কিন্তু মিলির মায়ের মনে কোনও দ্বন্দ্ব বা সংশয় ছিল না জামাই নির্বাচনে। আমার দুর্ভাগ্য, উনি রইলেন না বেশিদিন। মিলি তার মায়ের হাতে তৈরি। সে বিচৰণ সহনশীল। অল্পে সন্তুষ্ট, সে আমার যোগ্য স্ত্রী। সংসারে কখনও মুখ ফুটে কিছু চায়নি। ভগবান অন্ৰত এইদিক দিয়ে আমাকে বঞ্চিত করেননি।

সুহিতা

বিয়ের আট দিন পর অষ্টমঙ্গলায় আজ আবার বাপের বাড়ি এসেছি। আচ্ছা, বাপের বাড়ি বলছি কেন? আমাদের বাড়ি তো মায়ের। মায়ের নামেই এই ফ্ল্যাট। দিদিরা চলে গিয়েছে; ছোড়দাও গৌহাটি ফিরে গিয়েছে। বাড়িতে আবার দাদা বউদি সুবু মা ও আমি। সবই আগের মত, তবু আলাদা।

বউদি আজ স্কুলে যায়নি। বোধহয় ভালমন্দ কিছু রাঁধছে। মা এতৰণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শ্বশুরবাড়ির গল্প শুনে স্নানে গেলেন। সুবু এতৰণ হই হই করছিল। ক'দিন বাদে পিসিকে দেখে খুব খুশি। যদিও আমি ওকে খুব একটা সময় দিইনি কোনওদিন। এখন বোধহয় বিরক্ত করছিল বলে বউদি ওকে পাশের ফ্ল্যাটের মাসিমার কাছে দিয়ে এসেছে।

অজয় আমাকে বাড়িতে দিয়ে ওদের ব্যবসার কাজে শেয়ালদা গিয়েছে। কার্ডবোর্ডের বাক্স তৈরি করে ওরা। এটা ওদের পারিবারিক ব্যবসা। বৈঠকখানায় ওদের কারখানা। অবস্থা তো সচ্ছল বলেই মনে হল। অবশ্য বিয়ের সময় একটা কৃত্রিম সচ্ছলতার সৃষ্টি হয় সব বাড়িতেই। আসল অবস্থাটা ঠিক বোঝা যায় না।

আমি আমার নিজস্ব যে খাটটা ছিল তাতেই শুয়ে আছি অথচ ঠিক যেন স্বস্তি পাচ্ছি না। গয়না নতুন শাড়ি একগাদা সিঁদুর যেন বড্ড ভার মনে হচ্ছে। সব খুলে আমার পুরনো একখানা কাফতান পরতে পারলে ভাল হত। কিন্তু তা হবার নয় কারণ থেকে থেকেই অন্যান্য ফ্ল্যাট থেকে কেউ না কেউ এসে একটু খেজুরে আলাপ করে যাচ্ছে।

বউদির কাছে রান্নাঘরে গেলে হয়– কিন্তু কোনওকালেই বউদির সঙ্গে আমার জমে না। যতটা ভালমানুষ ভাব করে থাকে বউদি মোটেই ততটা নিরীহ নয়। মুখ বুজে যা করবার তা করে যাবে। চোয়াল শক্ত করে, অপছন্দ হলেও যা বলা হবে তাই করবে। কোনওদিন বলবে না– এটা এভাবে করলে হয় না? তার থেকে কখনও সখনও একটু প্রতিবাদ করলে ওকে আমার অনেক কাছের মানুষ বলে মনে হত।

বউদি কখনওই আমাদের নিজের বলে মনে করেনি। তাছাড়া বউদির মধ্যে সবসময়েই একটা স্যাক্রিফাইসের ভাব আছে যা আমার খুব হাস্যকর লাগে। কত মাইনে পায়, তবু কখনও শখ করে নিজের জন্য ভাল শাড়ি ব্যাগ চটি কিনবে না। যেন মাইনের টাকা সব সংসারেই খরচ হয়। আমি আমার ওই মাইনেতেই সেবার যখন রে ব্যান সানগ্লাস কিনলাম দাম শুনে বউদি প্রায় মূর্ছা যায় আর কি! এর কোনও মানে হয়! আমি অত আত্মত্যাগে বিশ্বাসী নই। নিজের জন্য নিজেকেই করতে হয়। তার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই। আমি বহু মাসিমা কাকিমা গোছের মহিলাদের হা হুতাশ করে বলতে শুনেছি– সংসারের জন্য এত করলাম নিজেরা কোনওদিন ভাল খাইনি পরিনি পর্যন্ত, কিন্তু কী পেলাম। সেই জন্য আমি ঠিক করেছি, আমি ওই বঞ্চিতদের দলে কোনওদিনই যাব না। পরে ঠিকই একটা তিক্ততা আসে। সংসার তার নিজের মতে চলে। কবে তুমি কি দিয়েছিলে তা কি কেউ চিরকাল মনে রাখে? না তা রাখা সম্ভব? তার চেয়ে তোমার জীবন তোমার নিজের মত করে কাটাও। শখ আহ্লাদ যা থাকে মিটিয়ে নাও। অন্ৰত পরে হতাশা আসবে না যে কিছুই পেলাম না।

মা বেরোল স্নান সেরে। আমি আমার কয়েকটা বই গুছিয়ে নিই। ক্যাসেটগুলোও নিয়ে যাব। আমার খুব শখের এগুলো। ছোড়দা ছাড়া আমাদের বাড়িতে বইও কেউ পড়ে না, গানও কেউ শোনে না। ভুল বললাম। মা শোনেন। মায়ের পড়ার নেশাও খুব ছিল। আজকাল চোখের জন্যে পারেন না। আমার মনে হয় মায়ের থেকেই আমি ও ছোড়দা এই ভালবাসাগুলো পেয়েছি।

দাদা বড্ড কেজো আর সাদামাটা। বউদি অবশ্য মনে করে, সংসারের চাপেই দাদার এইসব বোধগুলি ফুটে উঠতে পারেনি। আমি মনে করি যাদের থাকে তাদের চাপের মধ্যেও থাকে। বউদি তো বিয়ের আগে গানের দলটলে থাকত। বিয়ের পর গানও গায় না, বই পড়তেও দেখি না। ওই খবরের কাগজ বা বড়জোর ম্যাগাজিন। আমি ভাল করে জানি, দাদা যদি বই পড়ত বা গান শুনত বউদিও ঠিক তাই করত। আমার একেবারে অসহ্য লাগে এত পতিব্রতা ভাব। কেন, তোমার একটা নিজস্ব জগৎ নেই? নিজস্ব ভালমন্দের বোধ নেই?

এইজন্য আমার ছোড়দাকে ভাল লাগে। ছোড়দা সবার সঙ্গে আছে, আবার নেইও। প্রতিদিনের কাজকর্ম খাওয়া ওঠাবসার বাইরেও নানারকম বিষয়ে ওর আগ্রহ আছে– পড়াশুনো করে নানা বিষয়ে। সংসারের ছোটখাটো ব্যাপারে তাই মাথা ঘামানোর মত ওর সময়ও নেই, উৎসাহও নেই। পুরুষমানুষ এমন হলেই মানায়। একটু উদাসীন– কখনও হয়তো

একটু হৃদয়হীনও মনে হয়– তবু তা ভাল– চব্বিশ ঘণ্টা সংসারের মুখ চেয়ে থাকার থেকে।

অজয় কেমন হবে কে জানে! কয়েকদিন ঘর না করলে কিছুই বোঝা যায় না। কী জানি– কত দিনে শ্বশুরবাড়ি মেয়েদের আপন বলে মনে হয়। আমার তো মায়ের কাছে এই ঘরটিতে যত আরাম হয় এমন আর কোথাও নয়। মা যতদিন ততদিনই এত আরাম ও নিশ্চিন্ততা। বউদি যে কত আমাদের আপন ভাবে তা জানা আছে। মা কত করে বললেন বিয়ের সময়ে একখানা নতুন ভাল শাড়ি কিনতে– বউদি কিছুতেই কিনল না। বলল– এত খরচের মধ্যে কোনও মানেই হয় না নতুন শাড়ি কিনবার। এত এত দামি শাড়ি পড়ে আছে, পরাই হয় না। কিনতে হলে সুহিতারই শখের পছন্দসই কিছু কিনে দিন। ভাবা যায়? এত আদর করে দিতে চাওয়ার এই উত্তর। শাড়ি কি কেউ প্রয়োজনে কেনে? কারই বা দামি শাড়ি নেই, তবু তো বাড়িতে বিয়ে হলে লোকে আহ্লাদ করে কেনে।

বিয়ের আগে থেকেই বউদির মুখে এত খরচ খরচ শুনেছি যে শখ করে কিছু কিনবার ইচ্ছেই চলে গিয়েছিল। তাও তো গয়না সবই মায়ের। আর বাবাও বিয়ের খরচ বাবদ আমার নামে টাকা রেখে গিয়েছিলেন। তা না হলে যে কী হত! অথচ বউদির ভাবটা যেন দাদাই খরচ করে বিয়ে দিচ্ছে। আমাকে আশীর্বাদ করে কিছু দিল না পর্যন্ত। তাও তো দিদিরা দুজন মিলে খাট আলমারি ড্রেসিং টেবিল দিয়েছে। শ্বশুরবাড়িতে সবাই জানল দাদারা কিছু দেয়নি। আমি আর কী করব! মাঝে মাঝে মনে হয় দাদা বউদির বদলে ছোড়দা এখানে থাকলে এই বাড়িটা আর একটু আরামদায়ক আর একটু ইন্টারেস্টিং হত।

কমল

কেয়াদের বাড়ি থেকে খুবই চাপাচাপি করছে। ওরা আর দেরি করতে রাজি নয়। সুহিতার বিয়ের বছর দুই পরে কলকাতায় অপেৰাকৃত ভাল চাকরিটা নিয়ে চলে আসবার আগে থেকেই কেয়ার ম্লাবাবা বি য়ের ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চাইছিলেন। আমি দেরি করছি, কারণ আমার একটা আলাদা বাসস্থান দরকার। এই বাড়িতে দাদা বউদি মায়ের সঙ্গে কেয়া একেবারেই থাকতে পারবে না। কেয়াকে আমি যতটুকু বুঝেছি নিজের মতন করে করতে পারলে ওর মত মেয়ে হয় না কিন্তু কোনওরকম বাধা বা ওর ব্যাপারে হস্ৰৰেপ ও সহ্যই করবে না।

ওর কোনও কিছু অপছন্দ হলে যেমন দ্রু চোখে রাগ ঝিকিয়ে ওঠে আবার খুশি হলে তেমনই নিঃশেষে আত্মসমর্পণ। যথেষ্ট নাটকীয়তা আছে আমাদের সম্পর্কের মধ্যে। আমি চাই না শুধু রান্না খাওয়া শোওয়া ছেলে মানুষ করা ইত্যাদির মধ্যেই কেয়ার জীবন আবদ্ধ হোক। একটা নিজস্ব ভাললাগা বা ভালবাসার জগৎ যদি থাকে তাহলে স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা অনেক সজীব ও সতেজ থাকে। কলকাতায় কেয়া যদি কিছু করতে চায় আমার পূর্ণ সম্মতি আছে, কিন্তু সমস্যা হল এ বাড়িতে থাকা নিয়ে। এটা মায়েরই বাড়ি। বউদির মনে যাই থাক মায়ের নিয়মেই চলে এসেছে এতদিন সবকিছু। বোনেদের অবাধ যাওয়াআসা থাকা – কলকাতায় এমন সুবিধেজনক বাসস্থানের সদ্ব্যবহার করেছে সবাই। কেয়ার সেটাই সব থেকে অপছন্দ। ও এত হইহল্লা লোকজনের ভিড় হাসিমুখে মেনে নেবে না সেটা পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে। তাছাড়া ও বরাবর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের চর্চা করে এসেছে। কলকাতায় এসে আরও ভাল করে তা শিখতে চায়। সেইজন্য গতকালই ফোনে কথা বলবার সময়ে ও বলেছিল– আমি নিজের সংসারে আমার মত করে চলতে চাই। তোমাদের ওখানে রেওয়াজ্ঞ টেওয়াজের মোটেই সুবিধে হবে না। তাছাড়া কিছু বাড়তি দায়িত্ব আসবেই তা এড়ানো যাবে না। তার থেকে তুমি আলাদা বাড়ি নাও।

যেটা কেয়াকে বলা যাচ্ছে না– মা চান আমরাই থাকি এখানে– মায়ের কাছে। ছোটবেলা থেকেই আমার প্রতি মায়ের পক্ষপাতিত্বটা আমি বেশ বুঝতে পারি। ভাইবোনেদের মধ্যে পড়াশুনোয় সবচেয়ে ভাল ছিলাম। ওদের তুলনায় দেখতেও আমি ভাল– এইসবই কি অতিরিক্ত আদরের কারণ? কী জানি।

কিছুদিন আগে পর্যন্ত ব্যাপারটা অনুভব করলেও এখন কিন্তু আমি একটা বাড়তি চাপ অনুভব করছি। আমার জীবনে কেয়া আসবার পর সব কিছুই নতুন করে ভাবতে হচ্ছে। কোনও মূল্যেই কেয়াকে আমি হারাতে চাই না। এখন মনে হচ্ছে আমার প্রতি মায়ের মনোযোগটা আর একটু কম হলেই ভাল হত। তাতে আমার যা খুশি করার একটা স্বাধীনতা থাকত। কেয়া তো আমাকে ঠাট্টা করে বলে 'কোলের ছেলে'।

আমারও আজকাল মনে হয় আমাদের বাড়িতে যেন বড় বেশি লোক, বেশি কথা। বাইরে বসার ঘরে এত গোলমাল হচ্ছে যে নিখিল ব্যানার্জির মেঘের আলাপটা শুনতে পরছি না ভাল করে। কী ঘন বর্ষা এবারে। বাইরে বেরিয়ে কেয়াকে একটা ফোন করব তার উপায় নেই। দাদা আবার বাড়ির ফোনটার এসটিডি কাটিয়ে রেখেছে। খরচ কমানোর জন্য নানারকম হিসেবনিকেশ আমি বুঝি না। কেউ যদি আমাকে স্বার্থপর ভাবে আমার কিছু করার নেই। কী করে সংসারে দু'পয়সা সাশ্রয় হবে সেই চিন্ৰা, আর অবসর মানেই একটা ফিল্ম বা বাইরে খেয়ে আসা, এর বাইরে অনেক কিছু করবার দেখবার পড়বার শুনবার আছে। আমি তো দাদা বউদির সঙ্গে দ্রুচার টে প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া কী বলব ভেবে পাই না। অবশ্য আমি কথা কম বলতেই ভালবাসি। এত কথা চারদিকে হয়। কথার পিঠে কথা– অর্থহীন কথা। আমি ভাবি এই বাঙালি জাতটা মোটেই আওয়াজ ছাড়া থাকতে পারে না। মানসিক শান্তির জন্য পুজো করে সেখানেও কাঁসরঘ ণ্টা হই হই ব্যাপার। কেয়াও ভালবাসে নৈঃশব্দ্য। আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা একসঙ্গে থেকেছি। সান্নিধ্যই টানে দুজনকে চুম্বকের মত। স্পর্শের মধ্যেই যত আবেগ। কথা মনে হয় কমই বলেছি।

দেখি– যত তাড়াতাড়ি পারি আলোচনা সেরে একটা মীমাংসায় পৌঁছুতে হবে। আমিও মনে মনে চাইছি একটা ছিমছাম বাসস্থান– যেখানে শুধু আমি ও কেয়া। মাকে একটা হাতখরচ দিলেই হবে বা কখনও কখনও ইচ্ছে হলে আমাদের বাড়িতে গিয়েও থাকতে পারেন। ভালই হবে একই শহরে মায়ের দুটো থাকার জায়গা হবে।

যুক্তি দিয়ে বিচার করলে মায়ের কিন্তু অসন্তুষ্ট হবার মত কারণই নেই। কিন্তু মা কিছু কিছু ব্যাপারে বড় অবুঝ আর রাগীও বটে। এটা হলেই বা তিনঘরের ফ্ল্যাট– ম্লাসু দ্ধ দুটো পরিবার এখানে অসম্ভব থাকা। কিন্তু যেহেতু এটা মায়ের বাড়ি, মা চান দুই ছেলেই এখানে থাকুক আর প্রতি মুহূর্তে আমরা যেন অনুভব করি আমরা মায়ের সংসারে আছি। মা বড় ডমিনেটিং। স্বামী থেকে শুরু করে ছেলে মেয়ে সবাই তা মেনে নিয়েছে। এমন কী বউদি পর্যন্ত মনের অসন্তোষ চেপে রেখে মায়ের প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। কিন্তু কেয়া অন্য ধাতুতে গড়া। আমি জানি কেয়া ও মায়ের সংঘাত অনিবার্য। সেইজন্য আমাদের আগে থেকেই সরে যাওয়া ভাল।

কেয়া

মিলিরা চলে গিয়েছে দু'সপ্তাহ হল। আমরা কিছু বুঝে ওঠার আগেই ওরা যাওয়ার বন্দোবস্ত করে ফেলেছিল। কমল যতই নিজেকে বুদ্ধিমান ভাবুক দাদার কাছে কিছুই নয়। কেউ জানতেও পারেনি ঘুণাক্ষরে– ওরা নিজেরা সব ঠিকঠাক করে না জানানো পর্যন্ত।

অথচ এমন হবার কথা ছিল না। ঠিক ছিল বিয়ের কটা দিন কেটে যাবার পর আমি ও কমল একটা সুবিধেজনক ফ্ল্যাট দেখে চলে যাব। কমল তো দ্রুএকটা দেখেই রেখেছিল, আমি দেখার পর ফাইনাল করার কথা ছিল।

বিয়ের পর আমরা কুলুমানালি বেড়াতে গেলাম। তারপর আমি গেলাম গৌহাটি। কমল গেল অফিসের কাজে ব্যাঙ্গালোর। একটু ঢিলে পড়েছিল ফ্ল্যাট দেখায় ঠিকই। আর আমি অত ভাবিওনি– যাব তো ঠিকই আছে, দু'দিন আগে আর পরে। তার মধ্যে যে মিলি ও দাদা নিজেদের ব্যবস্থা করে ফেলবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি।

ভাল মানুষেরই মত মায়ের সঙ্গে দাদার কথোপকথন হল। কমল তখনও অফিস থেকে ফেরেনি। সন্ধেবেলা মিলি আমাদের চা দিয়ে ঘরে গেল– নাকি স্কুলের খাতা জমে আছে। কী বুদ্ধিমতীর মত দৃশ্যের বাইরে চলে গেল। চা খেতে খেতে দাদা শুরু করল এইভাবে– মা তুমি তো জান মিলির দাদা এখানের ফ্ল্যাটটা বিক্রি করে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে একটা বড় ফ্ল্যাট কিনেছিল। ভেবেছিল যদি কোনদিন দেশে ফিরে আসে। তা

এখন তো আর আসা হচ্ছে না অথচ ওটা পড়ে থেকে নষ্ট হচ্ছে। সেইজন্য ওর ইচ্ছে যদি আমরা এটাতে গিয়ে থাকি। মা বললেন– মিলির স্কুলটা একটু দূরে হবে না? সুবুরও তো স্কুল আঁকার ক্লাস দূরে হয়ে যাবে।

– তা হবে। কিন্তু এখানেও কয়েকদিন পর অসুবিধে হবে। লোক বাড়বে। তিনটে ফ্যামিলি কি এমনিতেও এখানে ধরবে নাকি?

– কমলও তো দুএকটা বাড়িটাড়ি দেখছিল। দাদা একেবারেই উড়িয়ে দিল সে কথা– সেটা খুবই ইমপ্র্যাক্টিক্যাল হবে। অত খরচ করে নতুন ফ্ল্যাট নেওয়া। দেখ– আমাদের তো কোনও খরচ করতে হচ্ছে না। তাছাড়া কমল প্রায়ই অফিসের কাজে বাইরে যায়। কেয়া এই শহরের কিছুই জানে না। এখানে তোমার কাছে ও সবদিক থেকেই ভাল থাকবে। মাও বললেন– যা ভাল বুঝিস কর।

কী কায়দা করে মাকে আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিল। কমল যখন ফিরল তখন ওদের যাবার ব্যবস্থা পাকা। ওদের যাবার আগের দিন যখন কিছু জিনিস চলে গিয়েছে, কিছু ছড়িয়ে আছে এদিক ওদিক– মিলি বোধহয় ক্লান্ত বোধ করছিল। এক গ্লাস জল নিয়ে ডাইনিং টেবিলটায় এসে বসল। অন্যমনস্ক ছোট ছোট চুমুক দিয়ে জল খাচ্ছিল। চোখের দৃষ্টিও আনমনা। আমি জিজ্ঞেস করলাম– কাজের লোক পেয়েছ? ওই পাড়ায়?

– পাইনি। পেয়ে যাব।

– কাল কি দুপুরে খেয়ে তার পরে যাবে?

– দেখি।

কথা বাড়ানোর খুব একটা ইচ্ছে নেই বুঝতে পেরেও জিজ্ঞেস করলাম, দশ বছর ছিলে এখানে নিজের মত করে কত কিছু সাজিয়েছ। এখন ছেড়ে যেতে কষ্ট হচ্ছে না?

মিলি খানিকৰণ চুপ করে রইল। একটা মিনিবাস বিকট হর্ন দিতে দিতে চলে গেল। সেই আওয়াজটা থামার পর ও বলল– নিজের মত করে এই দশ বছর আমি কিছুই করিনি। এত দিনে আমি নিজের, একেবারে সম্পূর্ণ আমার নিজস্ব সংসার পাব।

এই পরম প্রাপ্তির সংবাদটা কিন্তু মিলি অন্যমনস্ক বিমর্ষভাবেই দিল। পরে বুঝেছি, মিলি একটা অপরাধবোধে ভুগছিল মাকে সম্পূর্ণ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার জন্য। অবশ্য এ কথা অস্বীকার করা যাবে না মাকে ওরা দুজনেই বারবার বলেছিল– যখনই ইচ্ছে করবে তখনই চলে যেও আমাদের কাছে।

এত দিন বাড়িতে সুবু দাদা ও মিলি থাকায় মায়ের মনোযোগটা খানিকটা ভাগাভাগি হয়ে যেত এখন কেউ না থাকায় যেটা শুরু করলেন সেটা এক কথায় অসহ্য। ছোটখাটো ব্যাপারগুলো এত বাড়িয়ে তোলেন যে বলার নয়।

প্রতিদিন কমলের খাবার সময়ে এসে বসবেন। এটা ওটা এগিয়ে দেবেন। যদি কোনওদিন কিছু দিতে ভুলে গিয়েছি বা ফ্রিজ থেকে সময়মত বার করা হয়নি তাহলে তো রীতিমত চাপা উল্লাস খেলে যায় চোখেমুখে। কমলের কাছে আমার সাংসারিক অকর্মণ্যতা প্রমাণ হয়ে যায় হাতেনাতে। মা একটু তেলমশলা বেশি দিয়ে রান্না করেন কারণ এ বাড়িতে নাকি বরাবরই স্বাস্থ্যের চেয়ে জিভের পরিতৃপ্তিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। আমি হয়তো বুঝিয়ে সুঝিয়ে কমলকে মাংসের স্টু খেতে রাজি করলাম– ঠিক খাবার সময়ে উনি এসে বললেন– অসুখবিসুখ না হলে সুস্থ শরীরে কি এমন খাওয়া যায়? মাংসের স্বাদ নষ্ট হয় বলে আমরা কোনদিন প্রেসারে পর্যন্ত রাঁধিনি। কমল তোর মনে আছে? তোর হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার রেজাল্টের পর সেই যে বন্ধুদের খেতে ডাকলি– শুধু পোলাও মাংস, বুঝলে কেয়া– সেই খাওয়া যদি দেখতে কমল বলল– মা মাংস কেউ রান্না করতে পারে না তোমার মত।

এর পরও কি আর প্রেসারে রান্না স্টু চলে? মাকে কিছুতেই বোঝাতে পারি না ওঁদের দিন গিয়েছে একরকম। আজকের যুগে এত সময় বা ইচ্ছে কারও নেই যে যেটা পনেরো মিনিটে কুকারে করা যায় সেটা দু'ঘণ্টা ধরে ঘেমেনেয়ে করার। তাছাড়া গ্যাসের অপচয়ও তো হয়। শুধু রান্না খাওয়া ছাড়া আধুনিক জীবনের অন্য দাবিগুলোও তো উপেক্ষা করা যায় না।

আমি তো কমলকে পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছি– তুমি যদি ভেবে থাক তোমার মায়ের মত করে আমি সংসার চালাব তবে খুব ভুল করবে। সত্যি কথা বলতে কি, প্রয়োজনটুকু ছাড়া রান্না করতে আমি ভালই বাসি না। মা যদি ভাবেন, এখানে আমাকে হারাবেন, তো ভাবুন। এতে যদি উনি তৃপ্তি পান তো আমার আপত্তি নেই।

প্রথমদিকে উনি আমাকে রান্নাঘরে ডাকাডাকি করতেন দেখবার জন্য শিখবার জন্য যাতে ওঁর অবর্তমানে সকলের কষ্ট না হয়– আমার আগ্রহ নেই দেখে এখন আর ডাকেন না। ভালই হয়েছে। একটা ছুতোও পেয়েছেন আমাকে ঠেস দিয়ে কথা বলবার।

গতকাল সন্ধেবেলা মিলি ও দাদা এসেছিল। মা হাবেভাবে আমার প্রতি অসন্তোষ প্রকাশ করছিলেন। আমার এত বিরক্ত লাগল যে ঘর থেকেই বেরোলাম না। তানপুরায় সুর বেঁধে রেওয়াজে বসলাম। খানিক বাদে জোর করেই ভুলে গেলাম বাড়িতে কেউ এসেছে।

আমাকে ওরা চেনে না। মিলির মত কে কী ভাববে, বলবে ভেবে আমার প্রাণ কাতর হয় না। আমি অনায়াসেই বিপক্ষকে উপেক্ষা করতে পারি। মিলিও তো এল না আমার ঘরে। অতিথির মত বাইরের ঘরে বসে রইল যেন শাশুড়ির কত আদরের। অথচ মা ওকে কোনদিন মানুষ বলেই ভাবেননি। অত ব্যক্তিত্বহীন ন্যাকড়ার মত হলে কেউ কোনদিন সংসার থেকে নিজের পাওনাগণ্ডা বুঝে পায় না। মুখ বুজে দশটি বছর প্রাণপাত পরিশ্রম করে সে কি পেল এদের কাছে?

সেই জন্য কমলকে আমি বলে দিয়েছি– সবার মন রেখে আমি চলতে পারব না। তোমার সঙ্গে আমার সম্পর্ক। আমি তোমার কথাই ভাবব। আমার এত রকম ননদ জা ভাসুর শাশুড়ি না হলেও চলবে।

ভাগ্যিস কমলও বেশি ঝুটঝামেলা পছন্দ করে না। কাল রাতে মায়ের থমথমে মুখ দেখে কী হয়েছে জিজ্ঞেস করায় বললাম, মিলিরা এসেছিল। আমি রেওয়াজ করছিলাম তাই ঘর থেকে বেরোইনি। তাছাড়া ওরা তো মার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিল। সেই থেকে উনি গম্ভীর হয়ে আছেন।

কমল বলল– এই সামান্য ব্যাপারেও যদি মায়ের মন খারাপ হয় তবে তো মুশকিল। এখানে থাকবেন কী করে এভাবে?

আমরা দুজনেই যেটা ভাবছিলাম অথচ মুখে বললাম না– তা হল মা কয়েকদিন মিলিদের কাছে গিয়ে থাকলেই পারেন।

রমলা

আজ ছ'মাস হল নিজের বাড়ি ছেড়ে বিমলের সংসারে এসেছি। ছেলের বাড়ি তো নিজেরই। সবাই তাই বলে ভাবে। আমি কিন্তু কোনদিনই সেভাবে ভাবিনি।

উনি ফ্ল্যাট কিনলেন আমার নামে। বললেন– আমি তো আগে চলে যাব। তোমার বড় জেদ। কারও সঙ্গে থাকতে পারবে না, অন্তত ছাদটুকু রইল তোমার নিজস্ব। ভাগের মা হয়ে এদিক ওদিক করতে হবে না।

উনি থাকলে এখন দেখতে পেতেন মাথার ওপর ছাদটুকুই সব নয়।

ছাদের তলাটা যদি মানুষের বসবাসযোগ্য না থাকে, যদি জঙ্গল হয়ে যায়, তবে? বাড়ি তো শুধু ইট কাঠ দেওয়াল থাম নয়। সে তো মানুষের আশ্রয় আরামের জায়গা। শান্তির খোঁজেই তো ঘরমুখি হয় সবাই। সেগুলোই যদি না থাকে তাহলে ছাদটুকু আর আশ্রয় থাকে না। তা যেন মাথার ওপরে চেপে দমবন্ধ করে দেয়। অন্তত আমার তো তাই হয়েছিল গত এক বছর ধরে। কত দুঃখে কত কষ্টে যে বিমলকে বললাম– ক'দিন তোর কাছে গিয়ে থাকব। চোখে ভাল দেখছি না। শরীরও ভাল থাকছে না। কেয়ারও প্রথম বাচ্চা হবে। কে কাকে দেখে বল!

কত অপারগ হয়ে যে কুটুমবাড়িতে এলাম তা ভগবানই জানেন। কুটুমবাড়িই তো। ছেলেরও কেনা নয় এ ফ্ল্যাট। মিলির দাদা আমেরিকায় থাকে। সে কিনেছিল। এখন এরা থাকে। অতি চমৎকার বাড়ি। সমস্তটাই সাদা মার্বেলে মোড়া। আমার ঘরের সঙ্গে রাস্ত্বার দিকে একটা চমৎকার দক্ষিণমুখী বারান্দা আছে। বিকেল থেকে সেখানেই বসে থাকি। বসেই থাকি, উঠতেই ইচ্ছে করে না। অত যে রান্না করতে ভালবাসতাম, শুধু শুধু রান্নাঘরেই ঘুরে ঘুরে কত সময় কাটাতাম– এই একটু দুধ ঘন করলাম, ছানাটা কাটিয়ে রাখলাম, দই পাতলাম। শাকগুলো বেছে কাজ এগিয়ে রাখতাম। মোচা তো মেয়েরা বউরা ধরেই না। সপ্তাহে বাঁধাধরা একবার দু'বার করতেই হত। মাংস ইলিশ মাছ তো আমি ছাড়া কেউ রান্নাই করত না। ছেলেমেয়েরা টেবিলে বসে তৃপ্তি করে খাচ্ছে দেখলে মনটা জুড়িয়ে যেত। কোথায় গেল আমার সেই মনটা? আমার কিছু ইচ্ছেই করে না এখন। বিমল দুএকবার এটা ওটা খাব বলায় জোর করে রান্নাঘরে ঢুকেছিলাম– কিন্তু এত হাঁপিয়ে গেলাম যে বলার নয়। কেন এত ক্লান্তি আমার শরীর মন জুড়ে জানি না। এতই কি অথর্ব হয়ে পড়লাম?

মিলি বলছিল আসলে আপনার নিজের জায়গায় বরাবর করে অভ্যেস– এটা নতুন জায়গা বলেই এমন হচ্ছে। ক'দিন বাদেই আবার ইচ্ছে হবে। মিলিকে আমি বলতে পারলাম না। নিজের জায়গাতেই তো গত কয়েক মাস রান্নাঘরে ঢুকিনি।

কেয়া একদিন বলল– কমল আর আমার রান্নাটা এবার থেকে আমি করব। অত তেলমশলা খেয়ে দুজনেরই শরীর খারাপ হচ্ছে। তখনও পর্যন্ত জানি না যে ওর বাচ্চা হবে। শরীর খারাপ শুনি ওর মার সঙ্গে ফোনে কথা বলার সময়ে। বুঝতে পারি উনি নানারকম পরামর্শ দিচ্ছেন। কমল পর্যন্ত আমাকে এত বড় খবরটা দেবার প্রয়োজন মনে করল না। সত্যিই কি আমার দরকার একেবারেই ফুরল এ সংসারে! কাজ তো কিছুই রইল না। রান্না না থাকলে এত বড় দিনটা নিয়ে কী করি। চোখের জন্য বইটইও আজকাল আর পড়তে পারি না। গান আর কত শোনা যায়? তাও কি একা ভাল লাগে? আগে ভাল গানবাজনার ক্যাসেট বেরোলে কমল নিয়ে আসত। একসঙ্গে শুনতাম। কত কথা হত। কমলের সঙ্গে কয়েকবার ভাল গানের আসরেও গিয়েছি। উঠতেই ইচ্ছে করত না। এখন অফুরন্ত অবসর, কিন্তু আমার শুনবার ইচ্ছেটাই তো মরে যাচ্ছে। একদম একা তো কোনও কিছুই উপভোগ করা যায় না। অথচ পাঁচ সন্তানের মা হিসেবে আমার এত একা বোধ করার কথা ছিল না। বড় দুই মেয়েই দূরে। সুহিতা কাছে হলেও সবসময়ে আসতে পারে না নানা ঝামেলায়, এলেও থাকে না, কেয়ার নিষ্প্রাণ ঠাণ্ডা ব্যবহারও তার জন্য অনেকাংশে দায়ী।

কমল কথা কোনদিনই বেশি বলে না কিন্তু উপস্থিতি দিয়ে সোচ্চার দাবি নিয়ে সবসময়েই জানিয়ে দিত আমাকে ওর প্রয়োজন।

ওদের বাবা ছিলেন অত্যন্ত ঠাণ্ডা নির্বিরোধ মানুষ। ছেলেমেয়ে মানুষ করা, শাসন করা, আদর করা সবই আমি করেছি। আমার ওপরে কথা বলার কেউ ছিল না এ সংসারে। যখন যা ভাল বুঝেছি করেছি। বড় দুই মেয়ের বিয়ে উনি থাকতেই হয়ে গিয়েছিল। তাদের জন্য বিশেষ কিছু করতেই হয়নি। বিমলও তার বাবার স্বভাব পেয়েছে। আবাহনও নেই, বিসর্জনও নেই। আলুনি রান্না হলে নুন মেখে খেয়ে নেবে– মুখে কিছু বলবে না। পড়াশুনোতেও সাধারণই ছিল। বাবার দিকেই বেশি টান বলে মনে হত। বিমলের যেন ছেলেবেলা কোনদিন ছিল না। আমি মনে করতেই পারি না ও কোনও কিছু নিয়ে আবদার করেছে কোনদিন।

কমল এদের সবার বিপরীত– চেহারায় স্বাস্থ্যে বুদ্ধিতে আর স্বভাবে তো বটেই। ওর বায়না মেটাতে আমি নাস্তানাবুদ হতাম। প্রতিটি জিনিস নিখুঁত চাই। স্কুলের জামাপ্যান্ট বইখাতার মলাট সবই ঠিকঠাক না পেলে ওর মাথা গরম হয়ে যেত। আমি মুখে বিরক্তি দেখালেও মনে মনে খুশিই হতাম সব দিকে ওর সজাগ দৃষ্টি আছে দেখে। যা হয় একটা হলেই হল– এইরকম মনোভাব ওর ছোটবেলা থেকেই ছিল না। আমার স্বামী এবং বিমলের তুলনায় কমলকে আমার অনেক সজীব, অনেক কাছের মানুষ বলে মনে হত।

আমি যদিও রান্না করতে ভালই বাসতাম তবুও রান্না খাওয়া এবং সংসারের আর পাঁচটা মোটা কাজের বাইরে একটা জগৎ আছে বলে জানতাম। সংসারের ফাঁকে ফাঁকে সেই রঙিন জগতের রূপ্পরস্পর্শ গন্ধ অনুভব করার চেষ্টা করতাম। কমল ছিল আমার সঙ্গী। জানি বিমল ও মিলি ভাবে আমি একচোখা, কমলকে আমি মাথায় করে রাখি। হয়তো তাই– আমি অস্বীকার করছি না। ছোটবেলা থেকেই ও ওর দাবি জোর করে আদায় করে নিত বলে রেঁধেছি ওর পছন্দমত; কেনাকাটা করেছি ওর কথামত। যে কোনও ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে ওরই দ্বারস্থ হয়েছি। বিমলের তো কোনও ব্যাপারেই হেলদোল ছিল না– যা হোক হলেই হল। তাই কখন কমল নির্ভরযোগ্য সঙ্গী বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা হয়ে উঠেছিল নিজেই জানি না।

আজ ছ'মাস হল কমল ও কেয়া একবারও আসেনি। ফোন করলেও আমাকে ডাকেনি। মিলির কাছে শুনলাম কেয়া গিয়েছে ওর মায়ের কাছে। কমল একা ও বাড়িতে। কী খাচ্ছে, কেমন আছে জানি না। আমিও আর জিজ্ঞেস করি না। কী দরকার! রাস্তায় লোক চলাচল দেখি। কমলের মত কে একজন আসছে না? না, চোখে বড় ঝাপসা দেখি। দরজায় বেল বাজল কি? মিলি খুলছে না কেন? কমল বড় অধৈর্য– দরজা খুলতে দেরি হলেই রেগে যায়। না কমল নয়। কাজের মেয়েটির কাছে কে যেন এসেছে।

কমল– সত্যিই কি আর আসবি না তুই– তোর সঙ্গে কি আর দেখাই হবে না? বুকে বড় চাপ লাগে। যদি আর একবার ফিরে পেতাম তোদের ছেলেবেলা– যখন বউরা আসেনি– মায়ের সঙ্গেই ছিল যত ঝগড়া ভালবাসা। আজ কেন এক অস্থির লাগছে চিন্তা ঘুলিয়ে যাচ্ছে– বুকে বড় কষ্ট। যাই ঘরে গিয়ে শুই একটু।

উপসংহার

মায়ের শরীর খারাপ শুনে মেয়েরা সবাই এসেছিল। চেয়ে দেখেছিলেন সবাইকে। মনে হয় চিনতেও পেরেছিলেন। কথা অবশ্য বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। শুধু কমলই আসতে পারেনি। ও গৌহাটি গিয়েছিল কেয়ার কাছে। মায়ের মৃত্যুর পরদিন কেয়া একটি কন্যাসন্ত্বানের জন্ম দেয়।

ঋতা বসু
ভারতের কথাসাহিত্যিক

কবিতা

মুছে নাও সন্তর্পণে

অনিন্দিতা বসু সান্যাল

অনেক না বলা কথা গোধূলির রবির মতন
তোমার দু'চোখে বিঁধে আছে
বলেছ কাউকে...
দু'একটি আভাসে, চোখাচোখি
কিংবা ভ্রূকুটির ভঙ্গিমায়
কতদিন আর নিদ্রাহীন দীর্ঘরাতে
তারামহল দেখব
অন্তহীন অপেক্ষাতে দরজা খুলে রাখি
দু'কলম লিখে দাও– চাই শব্দের প্রেম বিলসিতা
সমস্ত দিনের শেষে, মন্ত্রোচ্চারণ
নামুক শ্রাবণধারা তোমার লেখনীপরে
সাদা-পাতা ভিজুক... ভিজুক
তোমার করতলে
ওহে প্রিয়তম
অক্ষরের চরিতমানসে
অবগাহন করব বলে
জেগে বসে থাকা
ক্ষতগুলো, মুছে নাও সন্তর্পণে...

অনিন্দিতা বসু সান্যাল ভারতের কবি

তৃষ্ণা

হোসেনউদ্দীন হোসেন

দারুজলে মেটে না তৃষ্ণা
সমুদ্রজল নোনা
আকাশজলে দেহ ভিজল
মনতো ভিজল না
মনের ভেতর খরার দহন
আগুন নিভল না
তৃষ্ণা আমায় করল পাথর
জলের আশায় হলাম কাতর
বুক ফাটলো তবুও তোমার
মুখ ফাটলো না।

কত দূর?

অভিজিৎ বিশ্বাস

বেশ, এবার ঘরে ফেরা যাক তাহলে
অনেকটা পথ পার হয়ে
বড্ড ক্লান্ত এখন,
কলিংবেলের শব্দ শোনার জন্য
কেউ গালে হাত দিয়ে
অপেক্ষা করে আছে।

পথের এই সাহসী হাতছানি
শেষ হয়ে যায় পথেই।
কিছুদূর যাওয়ার পরেই
নিভে আসে আঁচ,
অন্ধকার নেমে আসার আগেই
বাড়ি ফেরার সাধ জাগে তখন।

সাবধানী আলোকের বৃত্তে
এদিক-ওদিক তাকাই
জেব্রা-ক্রসিং ধরে রাস্তা পার হই
নির্বিঘ্নে–
পৃথিবীর বয়স বেড়ে যায় একদিন

শহরের সব কংক্রিট দেওয়াল বিদীর্ণ করে
পশ্চিমাকাশে জেগে ওঠে
একফালি রূপোলি চাঁদ,
ফের বুকের মধ্যে শুরু হয় আলোর কাঁপন
চন্দ্রাহত আমি হারাই পথ,
অস্পষ্ট হয়ে যায়
চিরচেনা সদর দরজাখানা
আর কত দূর?

অভিজিৎ বিশ্বাস ভারতের কবি

ভিখিরি

শংকর ঘোষ

স্থির আবর্তের মধ্যে। এই ঠিক আছে। শুধু ভেসে থাকা। শ্রান্ত অপরিষ্কার জলে ভেসে আছে বাতিলের দল। এরা কেউ নামী ব্র্যান্ড ছিল বোঝা যায় মলিন লেবেলে। উৎসুক নয় জোয়ার-ভাটায়। মূল স্রোত বয়ে যায়। চারিপাশ দিয়ে। বহতা জীবনে আচম্বিতে টাল খেয়ে ঢুকে পড়া এ স্থির দশায়। প্রাণ আছে তাই ভেসে থাকা শ্বাস নেওয়া হাত পাতা দুয়ারে দুয়ারে। তবু অমাবস্যা নিস্তব্ধ রাতে কারও চোখে ফেলে আসা জ্যোৎস্না কিরণ... কোনও স্নেহমাখা হাত। রাতের ফুটপাথে ঝরে দীর্ঘ কত শ্বাস।

শংকর ঘোষ ভারতের কবি

আঁধার

মলয়চন্দন সাহা

মোম আজ প্যারাফিনে ডুব দিয়েছে
সেখানেও ভেজালের বেসাতি
অজস্র কৃত্রিম আলো-আঁধার
বৃত্তকে মিছেমিছি করছে পরিক্রমণ

জীবন আলোকিত হচ্ছে কী–
শুধুই আলোকহীন ঘুরে বেড়ানো
কাকেদের কথোপকথনও আজ কর্কশ ঠেকে
তারও একটা আলাপ আছে

এই আঁধারে
অনেক অনেক আলো পেলাম
জোনাকির আলো পেলাম কই!

মলয়চন্দন সাহা ভারতের কবি

কার হাতে রেখে যাব

তাপস মিত্র

কার হাতে রেখে যাব এই রাজ্যভার
কার হাতে বেঁধে দেব কবচ-কু-ল
মাটিতে দাঁড়িয়ে যারা–
আমাদের শরীরের প্রতিটি রোমকূপ থেকে
ঝুরি নামে, বট নয় সিন্ধ বকুলও নয়
শুধুই বনসাই বামন উদ্ভিদ।

কার হাতে দিয়ে যাব এই রাজ্যভার
কার হাতে পরাব সম্প্রীতির রাখি
বুকের বারুদ থেকে আগুন নয়
শুধুই আর্তনাদ চুলির ধোঁয়া
অবরুদ্ধ স্রোতজুড়ে কালো ছাই মৃত আঙ্গার।

কার দিকে বাড়াব এ হাত কার হাতে বরাভয়
সমগ্র শরীর ঘিরে জরার আগ্রাসন
চারপাশে ছড়ানো জতুগৃহ
অজগর শুয়ে থাকে প্রকাশ্য রাস্তায়
পথের দুধারে পড়ে আছে ছেঁড়া ন্যাকড়া
বোতলের ছিপি আর বাহারি পলিথিন

তাপস মিত্র ভারতের কবি

শুভ্রা মুখার্জির জন্য এলিজি

আল মুজাহিদী

এ-বাংলার মৃত্তিকা–তোমারই মৃত্তিকা
সসাগরা পৃথিবী আমার!
শোকস্তব্ধ, স্মৃতিবন্ত তোমার মৃত্যুতে!
অন্ধকারে আলোকবর্তিকা জেগে আছে
মৃত্তিকা মন্দিরে–। এ-মৃত্তিকা-মন্দির আমার–
রুধির মৃত্তিকা। মৃত্তিকার ধূলিকণাগড়া বসুন্ধরা
অমরাবতীর তীরে বয়ে নিয়ে যায়!
আহা, নিভে যায় মানব জীবন–
অকস্মাৎ অশ্রুতকণ্ঠ মহাতরঙ্গ বিভঙ্গে ভেঙে পড়ে
অলৌকিক অন্তরকক্ষের জ্যোতির জগতে ভেসে যায়–!!
কী অদৃশ্য তমসায় ভেসে যায়–!!
এ-পৃথিবী সান্দ্র্যসিক্ত বারবার
অশ্রুতের অভিজ্ঞায়।

মর্ত্যের অলিন্দে ফিরে এসো তুমি, হে জীবন
এই অমৃতের আঙিনায়। পরমসত্তার
নিরন্ধ্র নিভৃত অন্ধকারে–
বিবর বিথারে ফিরে এসো,
জন্ম-মৃত্যু প্রকৃতির অমোঘ আখ্যান! দিব্য ধারাপাত
জন্ম-মৃত্যু, মৃত্যু-জন্ম জানি কম্প্র আলোর প্রপাত!
হে মৃত্যু! অনিবার্য সম্ভার
জগত-সংসার।
এ-বাংলার মৃত্তিকা–তোমারই মৃত্তিকা–
প্রণব-প্রভব–
ধ্রুবপদ বাংলার বৈভব...

উইঢিবি

বিমল গুহ

নাতিদীর্ঘ দেয়াল উঠেছে সম্মুখে– ক্ষতি নেই!
স্মৃতিপটে ভস্মস্তূপ উইঢিবি মানুষের পরিচিত মুখ
ভেসে ওঠে; বোধের অসুখ হলে কাল ধর্মে
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত টেকে না কিছুই,
রতি ঘাম ক্লান্তি ঘুম আগুনের কাছে সমর্পিত।

শরীর নশ্বর শুধু অবিনশ্বর স্মৃতিসুখ,
সমুদ্রের ফেনাঢেউ আশরীর মিলেমিশে আছে
কবিতায়! জলসীমা সুনির্দিষ্ট নয় এই প্রকৃতির কাছে
তবু জল সীমায়িত থাকে জলাধারে।
স্মৃতিপ্রেম ক্লান্তি ও ছায়ার কাছে সমর্পিত নয়,
হৃদয়বৃত্তির কাছে অবরোধ পরাজিত-ভাষা চিরদিন;
শুধু উইঢিবি চিরস্থায়ী চিহ্ন রাখে হৃদয়-দেয়ালে।

নতুন
HARPIC
ALL IN 1
ট্রাই করেছেন কি?
কঠিনতম দাগ দূর করে
৯৯.৯% জীবাণু ধ্বংস করে
দূর্গন্ধ দূর করে
HARPIC
POWER PLUS
ALL IN 1

প্রবন্ধ

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় বুদ্ধিবৃত্তি

মোহাম্মদ নূরুল হক

অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা, মনীষা, অধ্যয়ন ও কল্পনার মিথস্ক্রিয়ায় সৃজিত হয় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। মনের বিশৃঙ্খল অবস্থা সৃজনের শ্রেষ্ঠ সুযোগ কিন্তু শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির পূর্বশর্ত শৃঙ্খলা। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বানুসারে, মহাবিশ্বে গ্রহ-উপগ্রহ সৃষ্টির পেছনে নক্ষত্রের বিশৃঙ্খলাই দায়ী। কোন সুচিন্তিত প্রক্রিয়ার ফলে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ ও সংকোচন ঘটে না। সৃষ্টিশীলতার যে-কোন প্রপঞ্চের ক্ষেত্রেও এই সূত্র আংশিক সত্য। কবি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-ভিন্ন স্বকপোলকল্পিত বিষয়কে সব সময় কবিতা করে তুলতে পারেন না। যিনি পারেন তিনি হৃদয়বৃত্তির কাছে যেমন সৎ নন, তেমনি বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। যে কবির অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার বিচিত্রমুখী, অনেকানেক ঘটনার যিনি গভীর পর্যবেক্ষক, তাঁর পক্ষে কেবল স্বকপোলকল্পিত সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব নয়। পাঠ ও যাপিত-জীবনের অভিজ্ঞতা যাঁকে প্রাজ্ঞ করে তুলেছে, কল্পনা যাঁকে করেছে কবি, তাঁর কবিতায় বুদ্ধির দীপ্তি এবং মনীষার ছাপ থাকবেই। ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতার বাইরে গিয়ে কেবল কল্পনায় ভর করে প্রকাশ করতে পারে না। অত্যল্প পাঠের ওপর নির্ভর করে কবি কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠতে পারেন কিন্তু বিপুল পঠন-পাঠনে যিনি নিজেকে ঋদ্ধ করে তুলেছেন, তাঁর পক্ষে যুক্তিহীন কল্পনার স্রোতে ভেসে যাওয়া সম্ভব নয়। তাঁকে হতে হয় বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও কল্পনার সমন্বয়ক। একই সঙ্গে ইতিহাস-ভূগোল-রাজনীতি-অর্থনীতি-ধর্ম ও সমাজ সচেতনও। আধুনিক যুগের জটিল পরিস্থিতির ভেতর বসবাস করে সময়ের জটিল আবর্তন শনাক্ত করাও তাঁর দায়।

আধুনিক বাংলা কবিতার প্রথম আধুনিকদের একজন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর কবিতায় আবেগের চেয়ে প্রজ্ঞা, কল্পনার চেয়ে অভিজ্ঞতা এবং ভাবালুতার চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় বহুল পরিমাণে বিধৃত। ফলে তাঁর কবিতা সহজবোধ্য হয়ে ওঠেনি। এর কারণ কবিতা নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে ধ্যানস্থ হওয়া এবং কবিতাকে অভিজ্ঞতা ও ভাবনা প্রকাশের বাহন করে তোলা।

সুধীন দত্ত কবিতাকে অভিজ্ঞতা ও কল্পনার সমন্বয়ে প্রজ্ঞার স্মারক করে তুলেছেন। চিন্তাশূন্য কল্পনাবিলাসিতার বিপরীতে অবস্থা নিয়েছে তাঁর কবিতা। সঙ্গত কারণে অপ্রস্তুত পাঠকের পক্ষে তাঁর কবিতার রসাস্বাদন অনায়াসসাধ্য নয়। একথা অস্বীকার যায় না যে, তাঁর কবিতায় তৎসম শব্দের বাহুল্য রয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে মিথ ও পাণ্ডিত্যের সংশেষ। এর অন্য কারণও রয়েছে। সুধীন দত্ত যুক্তিনিষ্ঠ এবং বিজ্ঞানমনস্ক। প্রমাণ ছাড়া অন্তঃসারশূন্য বিষয়ের প্রতি কোন মোহ ছিল না, বস্তুসত্যের ওপর কল্পনার প্রলেপে কবিতা সৃষ্টিই একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

শিক্ষা ও রুচিবোধ যাঁকে মার্জিত ও আবেগের সংহতি দিয়েছে, তাঁর পৰে প্রগলভতায় ভেসে যাওয়া দুরূহ। সুধীন দত্তের কবিতায় এমন এক মার্জিত রুচির প্রলেপ ছড়ানো যাকে দুর্বোধ্য বলে দূরে ঠেলে দেওয়া যায় না, সসম্ভ্রমে প্রণতি জানাতে হয়। এ কথা সত্য, তাঁর কবিতার সঙ্গে সাধারণ পাঠকের প্রীতিপূর্ণ কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠে না; যা গড়ে ওঠে দীক্ষিত পাঠকের ক্ষেত্রে।

এ প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথ দত্তের *কাব্য সংগ্রহ*র ভূমিকায় লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু, 'সুধীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন, তাঁর স্বভাবেরই প্রণোদনায়, কিন্তু তাঁর সামনে একটি প্রাথমিক বিঘ্ন ছিলো বলে, এবং অন্য অনেক কবির তুলনায় যৌবনেই তাঁর আত্মচেতনা অধিক জাগ্রত ছিলো বলে, তিনি প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন– যা আমার উপলব্ধি করতে অন্তত কুড়ি বছরের সাহিত্যচর্চার প্রয়োজন হয়েছিলো– যে কবিতা লেখা ব্যাপারটা আসলে জড়ের সঙ্গে চৈতন্যের সংগ্রাম, ভাবনার সঙ্গে ভাষার, ও ভাষার সঙ্গে ছন্দ, মিল, ধ্বনিমাধুর্যের এক বিরামহীন মলযুদ্ধ। তাঁর প্রবৃত্তি তাঁকে চালিত করলে কবিতার পথে– সেপর্যন্ত নিজের উপর তাঁর হাত ছিলো না, কিন্তু তারপরেই বুদ্ধি বললে, 'পরিশ্রমী হও।' এবং বুদ্ধির আদেশ শিরোধার্য করে অতি ধীরে সাহিত্যের পথে তিনি অগ্রসর হলেন, অতি সুচিন্তিতভাবে, গভীরতম শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে।' শিক্ষা ও রুচিবোধ যাঁকে মার্জিত ও আবেগের সংহতি দিয়েছে, তাঁর পক্ষে প্রগলভতায় ভেসে যাওয়া দুরূহ। সুধীন দত্তের কবিতায় এমন এক মার্জিত রুচির প্রলেপ ছড়ানো যাকে দুর্বোধ্য বলে দূরে ঠেলে দেওয়া যায় না, সসম্ভ্রমে প্রণতি জানাতে হয়। এ কথা সত্য, তাঁর কবিতার সঙ্গে সাধারণ পাঠকের প্রীতিপূর্ণ কোন সম্পর্ক গড়ে ওঠে না; যা গড়ে ওঠে দীক্ষিত পাঠকের ক্ষেত্রে।

প্রবুদ্ধি ও হৃদয়াকুতি– এ দুয়ের মিথস্ক্রিয়ায় যে কবিতার সৃষ্টি, সে কবিতা পাঠকের মনকে সহজে আকৃষ্ট করে না কিন্তু চিন্তাজগতে সূক্ষ্ম অভিঘাত সৃষ্টি করে। তাঁর কবিতা বিশেষভাবে পূর্বকল্পিত সৃষ্টি; কোনভাবেই আকস্মিক ঘটনা কিংবা তাৎৰণিক অনুভূতির তরল প্রকাশ নয়। 'কবিতার নির্মাণ: সুধীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে অশ্রুকুমার শিকদার উলেখ করেছেন, 'সুধীন্দ্রনাথের কবিতার গঠন উদ্ভিদের অচিন্তিতপূর্ব নিয়মে সম্পাদিত হয় না। তার বিকাশ ও শ্রীবৃদ্ধি স্থাপত্যের মতো পূর্বপরিকল্পিত। বাস্তুশিল্পী যেমন বুপ্রিন্ট বা নকশা তৈরি করে তারপর সৌধনির্মাণে হাত দেন, তেমনি এই কবির প্রতিটি কবিতার পিছনে আমরা এক পূর্বকল্পনা বা নকশার অস্তিত্ব অনুভব করি। ইটের মতো শব্দ সাজিয়ে সাজিয়ে গড়ে ওঠে তাঁর কবিতার এক একটি স্তবক। ন্যায়ের পরম্পরায় সেই স্তবকগুলি সাজিয়ে নির্মিত হয় তাঁর এক একটি কবিতা। কবিতাগুলি যেন সঙ্গীত বেদনায় মুখর এক একটি কক্ষ। অনেকগুলি কবিতা নিয়ে একএকটি কাব্যসংকলন– যেন একএকটি মহাল। সেই সব মহাল নিয়ে এই মহিমাময় কাব্যের সৌধ।' অশ্রুকুমার সিকদারের এই মূল্যায়ন যথার্থ; কিন্তু ইটের মত শব্দ সাজিয়ে নির্মাণের যে অভিমত, তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ এ কথা মেনে নিলে সুধীন্দ্রনাথকে কবিতা বিনির্মাণকলার একজন প্রকৌশলী বলেই মনে হয় এবং প্রকৃত কবির যে বৈশিষ্ট্য ও অভিধা, তা থেকে বঞ্চিত করা হয়।

সুধীন দত্ত কবিতাকে অভিজ্ঞতা ও কল্পনার সমন্বয়ে প্রজ্ঞার স্মারক করে তুলেছেন। চিন্তাশূন্য কল্পনাবিলাসিতার বিপরীতে অবস্থা নিয়েছে তাঁর কবিতা। সঙ্গত কারণে অপ্রস্তুত পাঠকের পক্ষে তাঁর কবিতার রসাস্বাদন অনায়াসসাধ্য নয়। একথা অস্বীকার যায় না যে, তাঁর কবিতায় তৎসম শব্দের বাহুল্য রয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে মিথ ও পাণ্ডিত্যের সংশেষ। এর অন্য কারণও রয়েছে। সুধীন দত্ত যুক্তিনিষ্ঠ এবং বিজ্ঞানমনস্ক। প্রমাণ ছাড়া অন্তঃসারশূন্য বিষয়ের প্রতি কোন মোহ ছিল না, বস্তুসত্যের ওপর কল্পনার প্রলেপে কবিতা সৃষ্টিই একমাত্র লক্ষ্য ছিল। কেবল ভাবের জগতে বিচরণ করে, যুক্তিহীন স্বপ্নচারিতায় প্রতিভার অপচয় ও সময়ের অপব্যবহারে ছিলেন অনীহ। যা কিছু দেখেছেন, উপলব্ধি করেছেন তাকেই কবিতায় রূপান্তর করেছেন। তাঁর কবিতার বিষয়আশয় হয়ে উঠেছে খুব তুচ্ছ বিষয়, কিন্তু তার প্রকাশভঙ্গির আভিজাত্যে বিন্দুমাত্র আঁচড় লাগেনি। 'উটপাখি', 'কুক্কুট' নিয়ে কবিতা যেমন লিখেছেন তেমনি লিখেছেন দর্শন সমাজ রাষ্ট্র অধ্যাত্মসংকট নিয়েও। কিন্তু এসব কবিতাকে কোনভাবেই বিষয়ের অনুগত করে তোলেননি। তাঁর কবিতা যেমন দর্শনে আক্রান্ত নয়, তেমনি ধর্মীয় বাণী প্রচারের অনুষঙ্গও নয়। বরং কোন কোন সমালোচক তাঁর কবিতায় নিখিল নাস্তির সন্ধানও পেয়েছেন। এ সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসান 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : শব্দের অনুষঙ্গে' শীর্ষক প্রবন্ধে উলেখ করেছেন, 'সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জড়বাদী দু'টি জিনিস তাঁর কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। একটি হচ্ছে তিনি যে নাস্তিক একথা বারবার বলতে চান। এই বলাটা তো কবিতা হয় না। কিন্তু এই বলাটাকেই তিনি রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন কবিতায়। 'হয়তো ঈশ্বর নেই : স্বৈর সৃষ্টি আজন্ম অনাথ'– বলে তিনি একটা পরিতোষ লাভের চেষ্টা করেছেন। সৃষ্টি সত্যিই অনাথ কি না এগুলো নিয়ে দার্শনিকরা চিন্তাভাবনা করুন কিন্তু কবি এগুলো নিয়ে কথা বলবেন– এটা ভাবতে আমাদের অসুবিধা লাগে এবং এটা একটা বক্তব্যমাত্র। এ বক্তব্যের নানা রকম প্রসার ঘটিয়েছেন তিনি কবিতায়।' সুধীন্দ্রনাথের ঈশ্বরচিন্তা নিয়ে সৈয়দ আলী আহসান অস্বস্তি বোধ করেছেন। কারণ সুধীন দত্ত যেমন নিখিল নাস্তির জয়গান গেয়েছেন, তেমনি সৈয়দ আলী আহসান আস্তিক্যকে করেছেন শিরোধার্য। ফলে বিশ্বাসের দিক থেকে পরস্পর বিপরীত মেরুর ছিলেন বলেই সুধীন দত্তের দার্শনিক অভিজ্ঞা সৈয়দ আলী আহসান নির্মোহ দৃষ্টিতে গ্রহণ করতে অনীহ ছিলেন। সুধীন দত্তের শিল্প বা কাব্যসিদ্ধি নিয়ে সৈয়দ আলী আহসান নিঃসংশয় কিন্তু আদর্শিক বৈপরীত্যের কারণে তাঁর প্রতি তিনি সুপ্রসন্ন হতে পারেননি। একই কম অপ্রসন্ন ছিলেন দীপ্তি ত্রিপাঠীও। 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত' শীর্ষক গবেষণাগ্রন্থের শুরুতেই লিখেছেন, 'সুধীন্দ্রনাথের কাব্য যেন ভ্রষ্ট আদমের আর্তনাদ। তিনি স্বর্গচ্যুত কিন্তু মর্ত্যে অবিশ্বাসী। তাঁর মধ্যে বিজ্ঞতা আছে কিন্তু শান্তি নেই, যুক্তি আছে কিন্তু মুক্তি নেই। তাঁর কাব্য

সমাজ-জীবনে সত্য-মিথ্যার অস্তিত্ব আছে কিন্তু এই সত্য-মিথ্যা আপেক্ষিক, না শাশ্বত? যদি যুক্তিবোধ এবং বাস্তবতার নিরিখে সত্য-মিথ্যা নিয়ে ভাবা যায়, তাহলে সত্য এবং মিথ্যা দু'টি আপেক্ষিক পদ মাত্র; দুটিই সাপেক্ষ পদ। একটির অভাবে অন্যটির অস্তিত্ব প্রশ্নবিদ্ধ। মানবজীবনে এ ধরনের তর্কের সামাজিক কি আর্থিক, কোন মূল্য নেই। কিন্তু শিল্পের প্রশ্নে– বিশেষত কবিতায় সত্য-মিথ্যার সম্পর্ক সুনিবিড়। এ সম্পর্কে বিনয় ঘোষ 'সত্য ও বাস্তব' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'সত্য পরিবর্তনশীল ক্রমবর্ধমান ও সমাজাশ্রয়ী।' অর্থাৎ সত্যের কোন চিরন্তন রূপ নেই। কবিতায় এ সত্য বা বাস্তবতার প্রসঙ্গ আরও সূক্ষ্মভাবে এসেছে।

কোনো আশ্বাসের আশ্রয়ে আমাদের পৌঁছে দেয় না। সুধীন্দ্রনাথের নঞর্থক ও পরে ক্ষণবাদী জীবনদর্শন আমাদের ধর্মপুষ্ট বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন। এমনকী আধুনিক কাব্যের অনেকগুলি লক্ষণ যদিচ তাঁর মধ্যে বিদ্যমান তথাপি এই দর্শন-বৈশিষ্ট্যে তিনি আধুনিক কবিদের মধ্যেও স্বতন্ত্র। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যপাঠকালে মনে হয় কবি যেন এক নিঃসঙ্গ চূড়ায় দাঁড়িয়ে আধুনিক জীবনের নিঃসীম শূন্যতা নৈরাশ্যভারাতুর নয়নে অবলোকন করছেন।' আধুনিক যুগে মানুষের প্রতি মানুষ প্রশ্নহীন আস্থা স্থাপন করতে পারে না বিচিত্র কারণে। জীবনযাপ নে যেখানে অনিশ্চয়তা, যুদ্ধবিগ্রহে যেখানে মুহূর্তে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়, সামান্য কারণে যেখানে মানুষ খুন হয়, যেখানে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল রাষ্ট্রের নাগরিকদের পেছনে গুপ্তচর লেলিয়ে দিয়ে রাখে, আণবিক বোমার আঘাতে একএকটি ভূখ- মুহূর্তে ধূলিসাৎ হয়ে যায়, যেখানে ঐশীশক্তির কোনো নিদর্শন দেখা যায় না, সেখানে যুক্তিনিষ্ঠ, বিজ্ঞানমনস্ক কবি সংশয়ী হবেন; এটাই স্বাভাবিক। সুধীন দত্ত এই স্বভাবের জাতক। *অর্কেস্ট্রা* কাব্যের 'হৈমন্তী' কবিতায় লিখেছেন, 'বৈদেহী বিচিত্রা আজি সংকুচিত শিশিরসন্ধ্যায়'। এখানে স্পষ্ট হয়ে ওঠে হতাশা আর ভালবাসার জন্য কাকুতি এবং সবশেষে নাপাওয়া বেদনা। তাঁর মনে হয়েছে, চরাচরে চিরায়ত বলে কোন বস্তুর অস্তিত্ব নেই, নেই কোন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী কোন শক্তিও। ফলে তিনি আর 'শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে' সময় ব্যয় করবেন না। এই উপলব্ধি নিছক ধর্মবিদ্বেষ বা আস্থাহীনতা থেকে উদ্ভূত নয়, নয় নাস্তিক্যের চেতনা থেকেও। তাহলে অন্যত্র (*চপলা* কবিতায়) উচ্চারণ করতেন না, 'জনমে জনমে, মরণে মরণে, / মনে হয় যেন তোমারে চিনি।' নিখিল নাস্তিক বহুজনম বা পুনর্জন্মে বিশ্বাস করবেন কোন ভিতের ওপর নির্ভর করে?

সমাজজীব নে সত্যমিথ ্যার অস্তিত্ব আছে কিন্তু এই সত্যমিথ ্যা আপেক্ষিক, না শাশ্বত? যদি যুক্তিবোধ এবং বাস্তবতার নিরিখে সত্যমিথ ্যা নিয়ে ভাবা যায়, তাহলে সত্য এবং মিথ্যা দু'টি আপেক্ষিক পদ মাত্র; দুটিই সাপেক্ষ পদ। একটির অভাবে অন্যটির অস্তিত্ব প্রশ্নবিদ্ধ। মানবজীবনে এ ধরনের তর্কের সামাজিক কি আর্থিক, কোন মূল্য নেই। কিন্তু শিল্পের প্রশ্নে– বিশেষত কবিতায় সত্যমিথ ্যার সম্পর্ক সুনিবিড়। এ সম্পর্কে বিনয় ঘোষ 'সত্য ও বাস্তব' প্রবন্ধে লিখেছেন, 'সত্য পরিবর্তনশীল ক্রমবর্ধমান ও সমাজাশ্রয়ী।' অর্থাৎ সত্যের কোন চিরন্তন রূপ নেই। কবিতায় এ সত্য বা বাস্তবতার প্রসঙ্গ আরও সূক্ষ্মভাবে এসেছে। বাস্ৰবতা হল একটি বস্তুকে মানুষ কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করে? মানুষের উপলব্ধি এবং বোধের তারতম্যের ওপর নির্ভর করে কোন একটি বস্তুর গুণাগুণ বিচারের দৃষ্টিভঙ্গিও। কবিতা মানুষের উপলব্ধিজাত বিষয়গুলোর একটি। তাই কবিতার সত্য এবং বস্তুসত্য কোনকালেই এক ছিল না, এখনো নয়।

সময় সমাজ রাষ্ট্র ও ব্যক্তির আন্তঃসম্পর্কের ধরন সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথের ছিল গভীর পর্যবেক্ষণ। জীবন ও সংসার সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধি স্পষ্ট, কিন্তু এই অভিজ্ঞান প্রকাশে সংশয়ী। ফলে তাঁর চেতনার উপরিতল সম্পর্কে 'নাস্তিপ্রবণ' বলে শনাক্ত করা হয়। মহাশূন্যের দিকে তাকালে তাঁর মনে হয় 'নির্বাক নীল, নির্মম মহাকাশ'। কল্পনাপ্রবণ কবির কাছে নীল যেখানে রোম্যান্টিকতার প্রতীক, বুদ্ধিবাদী কবির কাছে সেখানে কেবল নির্মম। অথচ 'নাম' কবিতায় শুরুতে তাঁকে অস্থির ও অধীর মনে হয়। কাঙ্ক্ষিতকে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ার জন্য কালক্ষেপণ করার ধৈর্য নেই তাঁর। কাঙ্ক্ষিতের অভাবে 'অসহ্য অধুনা' এবং 'ভবিষ্যৎ বন্ধ অন্ধকার', ফলে তার 'কাম্য শুধু স্থবির মরণ'। চাওয়ার সঙ্গে সব সময় পাওয়ার সমন্বয় ঘটে না। হয়তো তাই, এই অস্থিরতা। হয়তো এ কারণেই এই উচ্চারণ– 'বজ্রাহত অশোকেরে অলজ্জায় করেছি বিনত /ক্ষণিক পুষ্পের লোভে।' কিন্তু এ প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির নিকট সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা সবার পক্ষে সম্ভব হয় না।

বুদ্ধির দীপ্তি ও প্রজ্ঞার অনুশাসনও যে কবিতা হয়ে উঠতে পারে, এর প্রমাণ সুধীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন অনেক কবিতায়। এর মধ্যে 'শাশ্বতী'ও একটি। কবিতাটি তিন পর্বের ছয়মাত্রার মাত্রাবৃত্তে রচিত। প্রথম দুই পর্ব পূর্ণমাত্রার শেষ পর্বের মাত্রা সংখ্যা দুই। মাত্রাবৃত্তের যে সাংগীতিক লয়, সে লয় এখানে পুরোপুরি রক্ষিত হয়নি। আবার অক্ষরবৃত্তের ধীর গম্ভীর লয়ও অনুপস্থিত। অর্থাৎ সংগীতময়তার ভেতর, ধ্বনিসংহতি, গাম্ভীর্যের ভেতর সুললিত সুর– এসবের সম্মিলনে সৃষ্ট এ কবিতা। ভাব ও বিষয়ের যুগলচিত্র প্রচ্ছন্ন হয়ে ওঠে এভাবে–

সেদিনও এমনই ফসলবিলাসী হাওয়া
মেতেছিল তার চিকুরের পাকা ধানে;
অনাদি যুগের যত চাওয়া, যত পাওয়া
খুঁজেছিল তার আনত দিঠির মানে।
একটি কথার দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী;
একটি নিমেষ দাঁড়ালো সরণীজুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি;

আগেই বলেছি, সুধীন্দ্রনাথকে কোন কোন সমালোচক নৈরাশ্যবাদী হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তাঁর এই নৈরাশ্যবাদী পরিচয় ছাপিয়ে ভিন্ন পরিচয় আবিষ্কারের চেষ্টা তেমন কারও ভেতর নেই। অথচ তাঁর কবিতাগুলোয় বেশির ভাগই প্রত্যাশা ও সামান্য সংশয়বাদের পরিচয় পাওয়া যায়। এই পঙ্‌ক্তিগুলো আশাবাদের সাৰ্য দেবে– 'বিরহবিজন ধৈর্যের ধূসরিমা /রঞ্জিত হবে দলিত শেফালি শেজে।' একটি বিশেষ কালসীমার পর অন্য ধরনের অভিজ্ঞতা মানুষের জন্য অপেৰা করে। এরপরেই সংকটকাল শেষও হতে পারে। ফলে জীবনের কোন কোন স্মৃতি মানুষ আজীবন ধরে রাখে। কখনোই সে স্মৃতি ভুলতে পারে না।

বুদ্ধির দীপ্তি ও প্রজ্ঞার অনুশাসনও যে কবিতা হয়ে উঠতে পারে, এর প্রমাণ সুধীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন অনেক কবিতায়। এর মধ্যে 'শাশ্বতী'ও একটি। কবিতাটি তিন পর্বের ছয়মাত্রার মাত্রাবৃত্তে রচিত। প্রথম দুই পর্ব পূর্ণমাত্রার শেষ পর্বের মাত্রা সংখ্যা দুই। মাত্রাবৃত্তের যে সাংগীতিক লয়, সে লয় এখানে পুরোপুরি রৰিত হয়নি। আবার অৰরবৃত্তের ধীর গম্ভীর লয়ও অনুপস্থিত।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক চিন্তাও সমানভাবে উপস্থিত। মৌলিক চিন্তকমাত্রই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধে বিশ্বাসী। পূর্ববর্তী কোন চিন্তকই তাঁর পূর্বসূরী নন; কারও চিন্তার রেশ তার প্রেরণার উৎস নয়। প্রকৃত চিন্তক মূলত একমেবাদ্বিতীয়ম্। চরাচরের ঘটনা ও দুর্ঘটনার ফলাফল এবং প্রপঞ্চগুলোর কার্যকারণ সম্পর্ক বিশেষণ ও প্রতিষ্ঠা করাই তার মূল কাজ। কোন মৌলিক চিন্তাই একই সঙ্গে দুই চিন্তকের হতে পারে না। কারণ মৌলিক চিন্তকের চিন্তা অনেক সময় অনির্দেশ্য ও অনির্দিষ্ট থাকে। বিক্ষিপ্ত চিন্তাকণিকার মিথস্ক্রিয়ায় একটি মৌলিক চিন্তার বীজ প্রথমে অঙ্কুরোদ্গম হয়।

অধ্যাত্ম চেতনা মানুষের একটি সহজাত প্রবণতা। সংকটে, সংশয়ে মানুষ মাত্রই অলৌকিক শক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। চায় পরিত্রাণ, নির্ভয় ও আশ্রয়। কেউ গোপনে, কেউ প্রকাশ্যে। যেসব অঞ্চলে বা সাংস্কৃতিক বলয়ে ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার সম্পর্ক সৌহার্দপূর্ণ ওই সব অঞ্চলের শিল্পকর্মেও অধ্যাত্মচেতনা শিল্পিত মহিমায় উজ্জ্বল।

তাঁর চিত্রকল্প ও উপমা ভাবাবেগ নয় বুদ্ধির সাব্য বহন করে। ফলে কেবল অনুভবগ্রাহ্য অলঙ্কারেই তিনি তৃপ্ত নন, দৃশ্যগ্রাহ্য ও অভিজ্ঞতালব্ধ চিত্রকল্পউপমাউৎ প্রেক্ষার প্রমাণ রেখেছেন কবিতায়। ভাবাবেগের চেয়ে বুদ্ধির দীপ্তি ও প্রজ্ঞা মানবজীবনে ভূমিকা রাখে বেশি। কেবল তীব্র ভাবাবেগ ও হৃদয়াকুতির কাছে সমর্পিত কবির পৰে তারল্যপূর্ণ কবিতা চর্চা সম্ভব, মনীষার প্রতি আস্থা রাখা অসম্ভব।

সুধীন্দ্রনাথের মানসপ্রকৃতি শেষ পর্যন্ত সংশয়বাদী। সংশয়ই তাঁর মনীষার ভূষণ। যেন কোন একটি নির্দিষ্ট বিন্দুতে আস্থা রাখতে পারেন না কবি, যেন কোন উপমাই তাঁর মনঃপূত হয় না, কেবলই বারবার রুচির পরিবর্তন ঘটান, রূপান্তর চান চিন্তারও। 'মহাসত্য', 'মার্জনা', 'সংশয়', 'প্রশ্ন', 'দ্বন্দ্ব', 'যযাতি', 'উপস্থাপন', 'মৃত্যু', 'সৃষ্টিরহস্য' কবিতাগুলো মূলত প্রশ্ন বিস্ময় সন্দেহ ও সংশয়কে আশ্রয় করে রচিত। মানবমনের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব বস্তুবিশেষকে পরীক্ষা করে নেওয়া, এক বস্তুকে অন্য বস্তুর সঙ্গে তুলনাপ্রতিতুলনা করে বিচার করা। এমন বিচার-প্রক্রিয়ায় সাফল্যও আসে। কিন্তু কেউ কেউ আবেগ ও চিন্তার বিশেষ মুহূর্তে এত বেশি উদ্বেল কিংবা অস্থির কিংবা নিরপেক্ষ হয়ে ওঠেন যে বিশেষ কোন বস্তুকে একাধিক বস্তুর সঙ্গে তুলনা করেও সন্তুষ্ট হতে পারেন না। কোন ব্যাখ্যাই তার মনের মত হয় না, তবু অব্যক্ত কোন এক ভাল লাগা তাকে বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের প্রতি সম্মোহিত করে রাখে।

রূপসী বলে যায় না তারে ডাকা;
কুরূপা তবু নয় সে, তাও জানি;
কী মধু যেন আছে সেমু খে মাখা;
কী বরাভয়ে উদ্ধৃত সেপাণি।
(সংশয়: *উত্তর ফাল্গুনী*)

যার রূপ-গুণ সম্পর্কে কোন স্থির সিদ্ধান্তে ব্যক্তি পৌঁছতে পারে না, তার সম্পর্কে শেষ প্রশ্ন তার মনেই বেজে ওঠে– 'ভালো কি তবে বেসেছি তারে আমি?/ বিজ্ঞ হিয়া শিহরে তাই ভয়ে?' প্রশ্নশীল ও সংশয়বাদীরা কোন একটি বিশেষ বিষয়কে বিনা তর্কে মেনে নিতে পারে না। তাদের হৃদয় যতটা আবেগে ভরা, ততোধিক প্রজ্ঞাপূর্ণ। ফলে নিজের স্বভাব সম্পর্কেও 'বিজ্ঞ হিয়া শিহরে' ওঠে ভয়ে। আদৌ শিহরে ওঠে কি না, সে বিষয়েও কবি নিশ্চিত নন, ফলে নিজেকেই প্রশ্ন করেন– 'বিজ্ঞ হিয়া শিহরে তাই ভয়ে?' সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে মৌলিক চিন্তাও সমানভাবে উপস্থিত। মৌলিক চিন্তকমাত্রই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধে বিশ্বাসী। পূর্ববর্তী কোন চিন্তকই তাঁর পূর্বসূরী নন; কারও চিন্তার রেশ তার প্রেরণার উৎস নয়। প্রকৃত চিন্তক মূলত একমেবাদ্বিতীয়ম্। চরাচরের ঘটনা ও দুর্ঘটনার ফলাফল এবং প্রপঞ্চগুলোর কার্যকারণ সম্পর্ক বিশেষণ ও প্রতিষ্ঠা করাই তার মূল কাজ। কোন মৌলিক চিন্তাই একই সঙ্গে দুই চিন্তকের হতে পারে না। কারণ মৌলিক চিন্তকের চিন্তা অনেক সময় অনির্দেশ্য ও অনির্দিষ্ট থাকে। বিক্ষিপ্ত চিন্তাকণিকার মিথস্ক্রিয়ায় একটি মৌলিক চিন্তার বীজ প্রথমে অঙ্কুরোদ্গম হয়। এরপরই সে অঙ্কুর ক্রমাগত পরিচর্যায় হয়ে ওঠে একটি বিশেষ প্রপঞ্চের ভাষ্য।

সে চিন্তার সঙ্গে কল্পনার অন্বয় ঘটিয়ে সৃষ্ট কবিতাও চিন্তাশীলদের আরাধ্য। আধুনিক বাংলা কবিতার প্রেক্ষাপটে চিন্তাসূত্র বৈচিত্র্যপূর্ণ। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ক্ষেত্রে কথাগুলো ষোলআনাই সত্য। 'মহাসত্য'র মূল ভাব চিরায়তকে অস্বীকার; আপেক্ষিকতার জয়গান। চিরকালীন সত্য বা শাশ্বত রূপকে ব্যঙ্গ করা হয়েছে এ কবিতায়। কিন্তু তার এ ব্যঙ্গপ্রবণতা দার্শনিকতা নয়, বুদ্ধিবৃত্তির সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে হৃদয়বৃত্তি অনেকাংশে উপেক্ষিত হয়েছে। কবিতায় অতিমাত্রায় বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা হৃদয়বানকে পীড়া দেয়, এ কথা অনস্বীকার্য। এ প্রসঙ্গে 'সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : শব্দের অনুষঙ্গে' শীর্ষক প্রবন্ধে সৈয়দ আলী আহসান বলেছেন, কবিতায় 'যে মেধা ও মননের পরিচয়টা তিনি দিয়েছেন, ইতিহাসটা দিয়েছেন, সেই মেধা এবং মনন শব্দের ক্ষেত্রে শব্দতেই পর্যবসিত এবং শব্দ সংগ্রহের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর মেধাকে পূর্ণ ব্যবহার করেন। অন্য কোনো ক্ষেত্রে তিনি অগ্রসর হতে আর পারলেন না।' অধ্যাত্ম চেতনা মানুষের একটি সহজাত প্রবণতা। সংকটে, সংশয়ে মানুষ মাত্রই অলৌকিক শক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। চায় পরিত্রাণ, নির্ভয় ও আশ্রয়। কেউ গোপনে, কেউ প্রকাশ্যে। যেসব অঞ্চলে বা সাংস্কৃতিক বলয়ে ধর্মীয় চেতনার সঙ্গে আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার সম্পর্ক সৌহার্দপূর্ণ ওই সব অঞ্চলের শিল্পকর্মেও অধ্যাত্মচেতনা শিল্পিত মহিমায় উজ্জ্বল।

যেসব অঞ্চলে ধর্মানুষঙ্গের সঙ্গে আধুনিকতা, প্রগতিবাদিতার সম্পর্ক সাংঘর্ষিক, সেসব অঞ্চলে অধ্যাত্মচেতনা গোপনে চর্চিত হয়। প্রকাশ্যে অলৌকিকতার বিরুদ্ধে সরব শিল্পীর শিল্পকর্মেও গোপনে চর্চিত হয় অধ্যাত্মপ্রেম। অধ্যাত্মসংকট একটি জটিল সংকট। বিজ্ঞানে প্রমাণিত নয়, এমন বিষয়ও স্বয়ং বিজ্ঞানীরাও লালন করেন। সঙ্গত কারণে কেবল বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিবোধ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এর গূঢ়ার্থ অন্বেষণ করা জরুরি। মানুষের ভয়, হতাশা, নিরাপত্তাহীনতাই তাকে অধ্যাত্মসংকটের দিকে প্রণোদিত করে। ফলে মানুষ অবদমনকেও অনিবার্য নিয়তি ভাবতে শুরু করে এবং মেনে নিতে বাধ্য হয়। এই সংশয়চিত্ত মানবজাতির একদিকে রয়েছে বিজ্ঞানের আবিষ্কার, বস্তুনিষ্ঠা এবং যুক্তিবোধ; অন্যদিকে রয়েছে অলৌকিকতার মোহ, ভয়, নিরাপত্তাহীনতা এবং অস্তিত্বের সংকট। সঙ্গত কারণে সংশয়ী চিত্ত একসময় নির্ভরতার আশ্রয় খোঁজে।

বস্তুসত্য বাঙালি সহজে মেনে নেয় না; মেনে নেওয়ার ভান করে মাত্র। বাঙালি জাতি হিসেবে মূলত ভাবুক। তাই ভাবনার জগতে যত পারে ঐশী শক্তিকে স্বাগত জানায়, কিন্তু

সুধীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে ভাববাদী ও সংশয়বাদী। কবিতার শরীর ও আত্মাজুড়ে সংশয় ও ভাবেরই প্রচ্ছন্ন ছাপ রেখেছেন তিনি। বস্তুসত্যকে অগ্রাহ্য করেও ভাববাদে আস্থা রেখেছেন। অলীক বিষয়কে দিয়েছেন মর্যাদা; কবিতা হয়ে উঠেছে ভাবুকের প্রাণের উৎসারণ, কল্পনার দৃশ্যগ্রাহ্য ভুবন। যুক্তি ও বাস্তবতা সেখানে হয়ে উঠেছে প্রায় অপাঙ্‌ক্তেয়। প্রবল নিষ্ঠা, যুক্তিবোধ ও কল্পনায় সৃষ্টি হয়েছে সংশয়ের ভুবন; নিখিল নাস্তি কিংবা অকাট্য বিশ্বাস সেখানে মান্যতা পায়নি। যেখানে বিজ্ঞানমনস্ক হতে চেয়েছেন, সেখানে হয়েছেন বড়জোর সংশয়ী।

বস্তুসত্যের নগদ ফলকেও বিচার করে ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে। কবিরা এই ভাবুকগোষ্ঠীর মন্ত্রণাদাতা। তাঁদের চিন্তারাজ্যে বস্তুসত্য ও কাব্যসত্য প্রায় সমান্তরাল পথ সৃষ্টি করে। সুধীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে ভাববাদী ও সংশয়বাদী। কবিতার শরীর ও আত্মাজুড়ে সংশয় ও ভাবেরই প্রচ্ছন্ন ছাপ রেখেছেন তিনি। বস্তুসত্যকে অগ্রাহ্য করেও ভাববাদে আস্থা রেখেছেন। অলীক বিষয়কে দিয়েছেন মর্যাদা; কবিতা হয়ে উঠেছে ভাবুকের প্রাণের উৎসারণ, কল্পনার দৃশ্যগ্রাহ্য ভুবন। যুক্তি ও বাস্তবতা সেখানে হয়ে উঠেছে প্রায় অপাঙ্‌ক্তেয়। প্রবল নিষ্ঠা, যুক্তিবোধ ও কল্পনায় সৃষ্টি হয়েছে সংশয়ের ভুবন; নিখিল নাস্তি কিংবা অকাট্য বিশ্বাস সেখানে মান্যতা পায়নি। যেখানে বিজ্ঞানমনস্ক হতে চেয়েছেন, সেখানে হয়েছেন বড়জোর সংশয়ী। ভাবুকের পক্ষে নিখিলনাস্তির জয়গান গাওয়া সম্পূর্ণ সম্ভব নয়; মাঝেমধ্যে বিশ্বাসের জগতে আলোড়ন তুলতে পারে মাত্র। এ কারণে প্রবল ধার্মিকের সঙ্গে কবির চিন্তার তেমন পার্থক্য দেখা যায় না। তাঁর কবিতায় চিন্তার স্ববিরোধ ও অধ্যাত্মবোধ গোপন সুতোর মতো ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় বস্তুবাদী দর্শন স্পষ্ট। আধুনিকতা-বাদীদের বিবেচনায় বস্তুবাদের প্রতি সমর্পিত সত্তাই আধুনিক সত্তা। কিন্তু নিটশের সে বিপুল নৈরাশ্যচেতনাও সুধীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি আচ্ছন্ন করতে পারেনি। বাঙালি কবি যতই পশ্চিমের আধুনিকতার সঙ্গে একাত্মতা পোষণ করার মনোভাব দেখান, ততটা দৃঢ় হতে পারেন না। বাইরে যতই যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞান-মনস্কতার পরিচয় তাঁর, ভেতরে ততই অধ্যাত্মচেতনা। সুধীন্দ্রনাথও এর ব্যতিক্রম নন। ফলে তাঁর কবিতায় বিজ্ঞান-যুক্তির পাশাপাশি অধ্যাত্মচেতনার সমন্বয় ঘটে সহজে। 'মৃত্যু', 'প্রার্থনা', 'মরণতরী', 'দ্বন্দ্ব', 'প্রত্যাবর্তন', 'অসময়ে আহ্বান', 'সান্ত্বনা', 'প্রতিহিংসা'সহ আরও বেশ কিছু কবিতায় উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিচর্যার সাৰাৎ মেলে।

অধ্যাত্মসংকট বাঙালির মৌলসংকট। এ সংকট বাঙালির উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া। ইচ্ছা করলেই যুক্তিবোধ, গবেষণা এবং বিজ্ঞান দিয়ে এ সংকট থেকে তার উত্তরণের সম্ভাবনা নেই। অন্তত যত দিন, বাঙালিজীবনে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কার্যকারণ জলবায়ু পরিবর্তনও আবহাওয়ার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার যৌক্তিক কার্যকারণ সম্পর্কের ফল বলে স্বীকৃত না হয়, তত দিন তার মনে হবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণ মানবজাতির পাপাচারের ফল– শাস্তি। এ কেবল ধর্মীয় অনুষঙ্গ নয়, জাগতিক স্বার্থসংশিষ্ট বিষয়েও প্রাসঙ্গিক। এ সম্পর্কে 'উটপাখি' উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। প্রথম চার পঙ্‌ক্তি স্মরণ করা যাক–

আমার কথা কি শুনতে পাও না তুমি?
কেন মুখ গুঁজে আছ তবে মিছে ছলে?
কোথায় লুকাবে? ধূ ধূ করে মরুভূমি;
ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া মরে গেছে পদতলে।

শূন্য মরুর বুকে হতাশাগ্রস্ত জীবন স্বাভাবিক। সেখানে যে-কোন ধরনের আহ্বান তৃষ্ণার্তের জন্য মহার্ঘ্যতুল্য। কিন্তু যখন একজন তৃষ্ণার্ত আশ্রয়ভালবাসার আহ বানও নীরবে উপেৰা করে তখন আহ্বানকারীরও আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত লাগে। তখন তারও মনে হতে পারে 'ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া মরে গেছে পদতলে'। যে উটপাখিকে কবির মনে হয়, মরুদ্বীপের সমস্ত খবর জানা প্রাণী, তাকেই আবার স্মরণ করিয়ে দেন কবি– 'তুমি তো কখনও বিপদপ্রাজ্ঞ নও'। অর্থাৎ মানুষ বা প্রাণী– সবাই অতীতের ঘটনা পর্যালোচনা করে অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে, ক্ষেত্র বিশেষ যোগসূত্র প্রতিষ্ঠার কার্যকারণ সম্পর্কও আবিষ্কার করতে পারে। কিন্তু অতীতবর্তমানের ঘটনা বিশেষণ করে ভবিষ্যতের কোন নিশ্চিত বার্তা কেউ দিতে পারে না; কেবল সম্ভাবনার ইঙ্গিত দেওয়া সম্ভব হয় তাদের পক্ষে। ফলে অতীতের সাক্ষী হয়েও কেউ কখনো সর্বজ্ঞ হতে পারে না। সঙ্গত কারণে চরাচরের নানা সম্পর্কের ধরন ও বিভেদের দায় একা কারও নয়।

আমরা জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দু জনে সমান অংশীদার;
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে
আমাদের পরে দেনা শোধবার ভার
তাই অসহ্য লাগে ওআত্মরতি।
অন্ধ হলেই কি প্রলয় বন্ধ থাকে?
আমাকে এড়িয়ে বাড়াও নিজেরই ক্ষতি।
ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে।
অতএব এসো আমরা সন্ধি করে
প্রত্যুপকারে বিরোধী স্বার্থ সাধি:
তুমি নিয়ে চলো আমাকে লোকোত্তরে
তোমাকে, বন্ধু, আমি লোকায়তে বাঁধি।

জাতির উদ্ধারকারী হিসেবে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ব্যক্তির প্রতিশ্রুতি হিসেবে শেষের চার পঙ্‌ক্তি অনন্যসাধারণ। আর 'অন্ধ হলেই কি প্রলয় বন্ধ থাকে' একই সঙ্গে প্রশ্নশীল উপলব্ধি ও প্রবচন। পুরো কবিতায় পরার্থপরতাকে মহিমান্বিত করা হয়েছে। উটপাখি একটি প্রতীক মাত্র, আড়ালে সমাজ ও রাজনৈতিক বিমুখ, উদাসীন মানুষের প্রমূর্তি। তাই সতর্ক উচ্চারণ– 'ভ্রান্তিবিলাস সাজে না দুর্বিপাকে'।

মানুষ নিজের নিরাপত্তার জন্য নিয়ম তৈরি করে; নিজেই সে নিয়ম লঙ্ঘন করে অন্যতর প্রয়োজনে। অন্যে যখন নিয়ম লঙ্ঘন করে তখন তার জন্য শাস্তি কামনা করে, কিন্তু নিজের নিয়ম লঙ্ঘনকে দেয় বৈধতা। মানবচরিত্রের এই এক ভয়াবহ দ্বৈরথ। দ্বিমুখী স্বভাব তার। অন্যকে শাস্তি দিতে সে কুণ্ঠাহীন, নিজের দোষের ক্ষেত্রে তৈরি করে অন্য বিধি। যে কাজ অন্যের বেলা গর্হিত বলে প্রচার করে, সে কাজ নিজের জন্য করে তোলে গর্বের। অন্তত এমনটাই প্রচার করে সে। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় এ বিষয়টি প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত।

মানুষ নিজের নিরাপত্তার জন্য নিয়ম তৈরি করে; নিজেই সে নিয়ম লঙ্ঘন করে অন্যতর প্রয়োজনে। অন্যে যখন নিয়ম লঙ্ঘন করে তখন তার জন্য শাস্তি কামনা করে, কিন্তু নিজের নিয়ম লঙ্ঘনকে দেয় বৈধতা। মানবচরিত্রের এই এক ভয়াবহ দ্বৈরথ। দ্বিমুখী স্বভাব তার। অন্যকে শাস্তি দিতে সে কুণ্ঠাহীন, নিজের দোষের ক্ষেত্রে তৈরি করে অন্য বিধি।

মোহাম্মদ নূরুল হক কবি, প্রাবন্ধিক

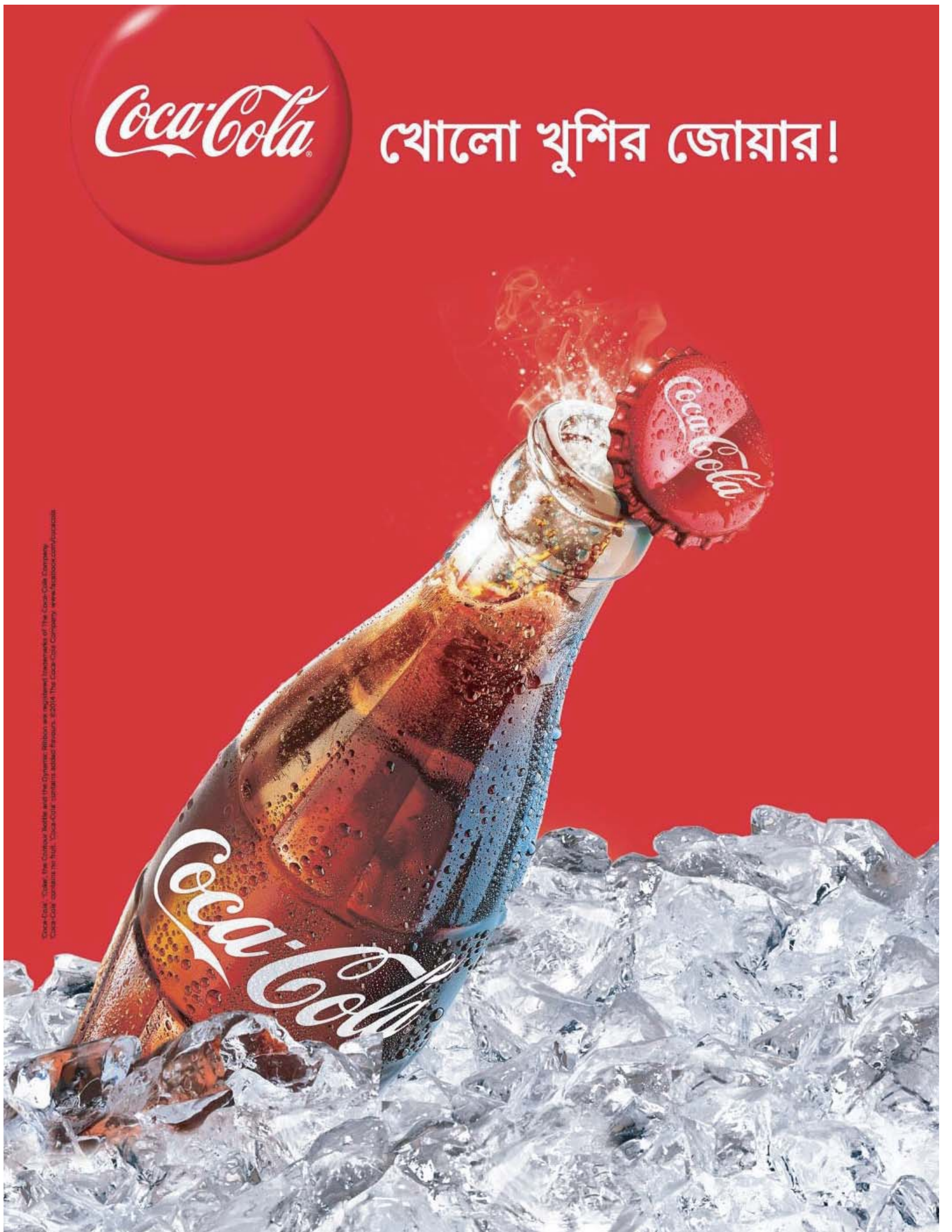
Coca-Cola
খোলো খুশির জোয়ার!
Coca-Cola
Coca-Cola
Coca-Cola, Coke, the Contour Bottle and the Dynamic Ribbon are registered trademarks of The Coca-Cola Company.
Coca-Cola contains no fruit. Coca-Cola contains added flavours. ©2014 The Coca-Cola Company www.facebook.com/cocacola

অনুবাদ গল্প

‘ইলুরে অবশ্যই আসছি’

গুড়িপতি ভেঙ্কাটাচলম

ট্রেনের ছোট একটা কম্পার্টমেন্টের আপার বার্থে আমি আমার বিছানা পেতে ব্যাগটা মাথার নিচে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। এগারোটা কিংবা বারটা হবে হয়তো, কে যেন আমাকে ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে দিলে চোখ খুললাম। একজন অপরিচিত বিধবা মহিলা নিচে দাঁড়িয়ে; বয়স চলি-শর বেশি, দেখতে অপূর্ব সুন্দরী। মাথার এলোমেলো চুলগুলোর অর্ধেকটারই রঙ ধূসর।

আমি এক ধরনের ঘোরের মাঝেই উঠে বসলাম। কম্পার্টমেন্টে আমরা দু’জন ছাড়া অন্য আর কেউ নেই। আমি বাইরের দিকে তাকালাম। চোখে পড়ল ‘নিছাদাভেলি স্টেশন।’

‘আপনি কে দয়া করে বলুন!’ আমি মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করলাম। তার মুখের হাসি হাসি ভাব আমার নজরে এল।

‘আগে নেমে আসুন।’ মহিলাটির কণ্ঠস্বরে পরিচিতজনের আভাস। কম্পার্টমেন্টের ল্যাম্পের আলো তার মুখের ওপর পড়ে অবর্ণনীয় সৌন্দর্যের বিচ্ছুরণ ঘটেছে বলে আমার মনে হল। কথা বলার সময় তার গোলাপী গাল দুটোয় টোল পড়তে দেখলাম। তার চোখ দুটো মোহনীয়। ঠোঁট দুটো পেলব আর লালচে, দাঁতগুলো মুক্তোর মত ঝকঝকে।

‘আপনি কে, অনুগ্রহ করে বলুন?’ আমি আবার তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

‘আমি বলছি , আপনি নেমে আসুন।’ তিনি একই কথা পুনরায় অন্তরঙ্গ কণ্ঠে বললেন।

মহিলাটি এবার আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করায় আমি হতবাক! তিনি বললেন, তোমাকে অনেকদিন ধরে খুঁজছি, কিন্তু দেখছি তুমি আমাকে ভুলে গেছ! আমি তার কথায় হতবিহ্বল হয়ে পড়লাম। আমি এ ধরনের কোন বিধবার কথা স্মরণ করতে পারছি না, আমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এমন কোন মহিলার সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়েছিল বলে আমার মনে পড়ছে না। আমি মহিলাটির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

লাফ দিয়ে উপর থেকে নামতে গিয়ে আমার পরনের ধুতি ঢিলা হয়ে প্রায় খুলে যাবার অবস্থা হল। মহিলাটি হেসে উঠে আমার ধুতির এক প্রান্ত ধরে লজ্জার হাত থেকে আমাকে বাঁচালেন। পেছন ফিরে আমি তার হাত থেকে ধুতির প্রান্তটা কেড়ে নিলাম। আমি পরনের ধুতিটা ঠিকঠাক করে আবার তার দিকে তাকালাম। মহিলাটির পরনে মহিশুরের সিল্কের ধুতি, বিধবা মহিলারা এ ধরনের ধুতি শাড়ির মত করে পরে। ধুতির কালচে পাড় জরির সুতোর তৈরি। প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা শরীরে ধুতিটা শাড়ির মত করে পরায় মহিলাটিকে সুন্দর লাগছে।

মহিলাটি এবার আমাকে তুমি বলে সম্বোধন করায় আমি হতবাক! তিনি বললেন, তোমাকে অনেকদিন ধরে খুঁজছি, কিন্তু দেখছি তুমি আমাকে ভুলে গেছ! আমি তার কথায় হতবিহ্বল হয়ে পড়লাম। আমি এ ধরনের কোন বিধবার কথা স্মরণ করতে পারছি না, আমার আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে এমন কোন মহিলার সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়েছিল বলে আমার মনে পড়ছে না। আমি মহিলাটির দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

'তোমার ছেলে বুফে কারে খানাপিনা করতে গেছে– তোমাকে বিষণ্ন দেখাচ্ছে কেন?' তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন।

মহিলাটি কে হতে পারে? আমার ছেলে বুফে কারে খানাপিনা করতে গেছে তার অর্থ কী! আমার তো একমাত্র ছেলে। তার বয়স মাত্র তিন মাস। আমার স্ত্রী ছেলেপুলে হতে বাপের বাড়ি গেছে। সে এখনও সেখানেই আছে। মহিলাটিকে স্বর্গীয় চেহারার একজন শয়তান বলে মনে করে আমি সাবধান হলাম।

'আমার কপালে এটা ঘটার পর তোমার সঙ্গে আমার আর সাৰাৎ ঘটেনি। সত্যি তো! তুমি আমাকে এতদিন পরে চিনবে কীভাবে? ন'বছর আগে তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা। সে সময় আমি দেখতে অন্যরকম ছিলাম।' তিনি কথা শেষ করে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলেন।

'একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে এর মাঝে অবশ্যই। আপনি আমাকে অন্য কেউ ভেবে ভুল করছেন।' আমি বললাম।

'আমি ভুল করছি? তুমি ভিজিয়ানা গ্রামের কলেজে পড়তে না?'

'হ্যাঁ পড়তাম।'

'তোমার নাম পুরুষোত্তম না ?'

'হ্যাঁ, আমি পুরুষোত্তম।'

'এখন তুমি আমাকে চিনতে পেরেছ?'

আমি স্মরণ করতে চেষ্টা করলাম কিন্তু স্মরণ করতে পারলাম না। মহিলাটি বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, পুরুষ মানুষের হৃদয় পাথর দিয়ে গড়া, সেখানে প্রেম নেই। তারা নির্দিষ্ট ঘটনাকেও মনে রাখতে পারে না। মহিলারা তাদের হৃদয়ে ওগুলোকে গেঁথে রাখতে পারে। ঈশ্বরের কৃপায় কোন কোন মহিলা তা স্মরণে রাখতে পারে। অন্য যাত্রী আসার আগে তুমি কি আমার পাশে বসে আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করবে?'

'আপনার পদবী কী?'

'আসল কথায় এস। এখন আমাকে আমার সম্প্রদায় এবং গোত্র বলতে হবে! ঈশ্বরের দয়ায় আমরা অনেক বছর পরে একত্রে মিলিত হয়েছি। এত বছর পরে আমি তোমার সাৰাৎ পেয়ে বড়ই খুশি হয়েছি। এমন একটা দিনও নেই যে তোমার কথা আমি ভাবিনি। তুমি আমাকে ছোট একটা উপহার দিয়েছিলে, যা আমার কাছে ছিল মহামূল্যবান, অথচ তুমি এখনও আমাকে চিনতে পারছ না।' মহিলাটি কথাগুলো বলে আবারও কাঁদতে শুরু করলেন। ভাল একটা ঝামেলা। তার কান্না দেখে আমি তার সামনে জড়ভরতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি কান্নার মাঝেই আবার বলতে শুরু করলেন, 'আমি তোমার মুখটা দেখেই তোমাকে চিনে ফেলেছিলাম, তোমার বাক্সে পুরুষোত্তম বিএ লেখা দেখে আমি তোমার সম্বন্ধে পুরোপুরি নিশ্চিত হই। তুমি বিএ পাশ করেছ জেনে আনন্দ পেলাম। তুমি কি আমাকে সত্যি সত্যি ভুলে গেছ? তোমার প্রতিবেশী অডিটরের কথা কি তোমার মনে পড়ে না?'

মহিলাটির এ কথা শুনে আমার মনটা অতীত দিনে ফিরে গেল। 'মাণিক্যাম্মা গারু। তোমার এতটা পরিবর্তন হয়েছে!' আমি আমার কপালে করাঘাত করে বলে উঠলাম। এবার আমি মহিলাটিকে তুমি বলে সম্বোধন করলাম।

সে সময় আমার বয়স আঠারো বছর। আমি কলেজে ইন্টারের ছাত্র। ষাট বছর বয়সী অডিটর গারু আমাদের পাসের বাড়ির ওপরতলায় বসবাস করতেন। মাণিক্যাম্মা বিপত্নীক অডিটরকে বিয়ে করেন। মাণিক্যাম্মার বয়স তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। তার কোন ছেলেপেলে না হওয়ায় তার ফিগার স্লিম, এক কথায় তাকে দেখতে পোরসিলিনের পুতুলের মত সুন্দর। আমাদের দু'পরিবারের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

তার বৈধব্য, শরীর স্বাস্থ্যের অবনতি, মাথার অর্ধেক চুল পেকে যাওয়াসহ নানা ঘটনা পরবর্তীকালে ঘটেছে, আমি তখন বুঝতে পারলাম।

আমার আঠারো বয়সের সময়ের কথা। একদিন আমি দুটোর দিকে কলেজ থেকে ফিরছিলাম। মাণিক্যাম্মা গারু আমাকে থামাল, আমি তাদের বাড়িতে গেলাম। সে ফোল্ডিং চেয়ারটা দেখিয়ে আমাকে বললো, 'তুমি আরাম করে বোসো।' দিনটা ছিল গ্রীষ্মের, গরমটাও বেশ, আমি তালপাখাটা হাত নিলাম। 'আমাকে বাতাস করতে দাও', সে আমার হাত থেকে হাতপাখাটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল। 'না, না আমি নিজেই বাতাস খাচ্ছি।' আমি প্রতিবাদ করলাম। 'এতে দোষ নেই।' সে আমাকে বাতাস করতে লাগল। আমি

সে সময় আমার বয়স আঠারো বছর। আমি কলেজে ইন্টারের ছাত্র। ষাট বছর বয়সী অডিটর গারু আমাদের পাসের বাড়ির ওপরতলায় বসবাস করতেন। মাণিক্যাম্মা বিপত্নীক অডিটরকে বিয়ে করেন। মাণিক্যাম্মার বয়স তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে। তার কোন ছেলেপুলে না হওয়ায় তার ফিগার স্লিম, এক কথায় তাকে দেখতে পোরসিলিনের পুতুলের মত সুন্দর। আমাদের দু'পরিবারের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

অডিটর গারু এ শহরে পাঁচ মাসের একটু বেশি দিন ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে আমি এক দীর্ঘ রসাত্মক মহাকাব্য রচনা করলাম। ওই মহাকাব্যে একশ' পঞ্চাশ দিনের একশ' পঞ্চাশটা সোনালি পত্র সন্নিবেশিত হল। প্রতিটি মুহূর্ত পরিপূর্ণ ছিল স্বর্গীয় অমৃতধারায়। তার সুর লয় ছিল শিল্পকলায় ঋদ্ধ। যদিও আমার জীবন ছিল দুর্দশাগ্রস্ত, আমি যেন বেতগাছের মত নুয়ে পড়তে থাকলাম। ওই পাঁচ মাসে গাছের ডালের মৌচাকের মধু নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকল।

চেয়ার থেকে উঠে বললাম, 'আমি কফি খেয়ে আবার কলেজে যাব।' 'আমি তোমাকে কফি দিতে পারছি না,' বলে সে ভেতরে গিয়ে একটা পেটে দুটো রসগোলা ও এক গ্লাস জল নিয়ে এল।

'এগুলো হোটেল থেকে আনা?' আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'আমি নিজেই বানিয়েছি' সে জবাবে বলল।

আমি কখনোই কল্পনা করিনি আমাদের বাড়ির মহিলারা এ ধরনের সুস্বাদু মিষ্টি বানাতে পারে। সে আমাকে বাতাস করতে করতে করতে বলল, 'মুখ সেভ করার বয়স তো তোমার হয়েছে! তাহলে তুমি সেভ করাও না কেন?' আমি তার কথা শুনে ভাবলাম, আমার মুখে নরম কেশ দেখা দিয়েছে। আমি লজ্জায় নাপিতের দোকানে যাই না।

'তুমি বড় হয়ে গেছ। আমরা অবশ্যই তোমার বিয়ের বয়সী একটা কনে খোঁজ করব।' সে বলল।

তার কথা শুনে আমি মন্ত্রমুগ্ধ! আমি গোগ্রাসে খেতে শুরু করলাম। দ্বিতীয় রসগোলাটাও খেয়ে ফেললাম। সে দ্রুত ভেতরে গিয়ে আমের চাটনি ও কফি নিয়ে এল। আমি সেগুলো খেয়ে চলে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালাম। সে আমাকে বলল, 'আমি অস্বস্তির মাঝে আছি। তুমি আমার সঙ্গে কিছু সময় থাক, দয়া করে।'

'কিন্তু কলেজ?'

'বিকেলে কলেজে গিয়ে কী হবে!'

'না না এখন আমার অপশনাল ক্লাস আছে।'

সে আমার হাতটা আঁকড়ে ধরে তার রুমে নিয়ে যেতে যেতে বলল, 'তুমি একটা ভাল ছেলে! পান খাবে?'

প্রথম দিনের ঘটনা আমার মনের কোণে ভেসে উঠল। আমি তার সঙ্গে সারাক্ষণ ছিলাম। তার ঠাট্টাতামাশায় প্রথম দিনেই আমি বিভ্রান্ত হয়ে পড়লাম। আমি মুখে পান পুরে দিয়ে উঠে পরার জন্য রেডি হলাম। 'আজ আর কলেজে গিয়ে কাজ নেই।' সে আমার গাল দুটোতে টোকা দিয়ে বলল। সে তার হাত দু'খানা আমার কাঁধ দুটোর রাখল। সে আমাকে জড়িয়ে ধরে বিছানার উপর বসাল।

হঠাৎ করে আমার সারা শরীর গরম হয়ে উঠল। সে আমাকে নিয়ে যা করতে লাগল, তাতে আমার মধ্যেও উত্তেজনা দেখা দিল। এক পর্যায়ে তা আমাকে বজ্রের মত আঘাত হানল। আমার বয়সী একটা ছেলের পক্ষে এ অবস্থায় মনে উত্তেজনা দেখা দেওয়াটাই স্বাভাবিক। আমি কিন্তু আগে কখনো মাণিক্যাম্মা গারুকে খারাপ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখিনি। তখন আমার বয়স আঠারো বছর; তার বয়স আমার চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। আমি তা বুঝতে পারলেও সে মুহূর্তে আমার পৰে রুম থেকে বের বাইরে যাওয়া সম্ভব ছিল না। আমি যেন বাসররাতে কনের পাশে বসে আছি, সে সময় আমার যেন তেমনই মনে হল।

'আগামীকাল তোমার প্রথম কাজ সেভ করানো। তোমার মুখটা ফুলের মত পেলব থাকবে, মুখে একরাশ দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল বাঁধিয়ে রাখলে তোমার মানায় না!' মহিলাটি আমার মুখের দাড়ি-গোঁফকে পছন্দ করে না, আমি তার কথা শুনে বুঝতে পারলাম। সে আবার বলতে শুরু করল,'প্রথম গজানো দাড়ি নরম থাকে।' সে আমার মুখটা তার মুখের দিকে তুলে ধরে তার দুটো বিস্ফারিত চোখে আমার মুখের ওপর দৃষ্টিপাত করল।

'আমি যা করলাম তা অন্য কাউকে বলবে না, আমাকে খারাপ ভেব না। আমরা পরস্পর অন্তরঙ্গ সেজন্যই আমি আমার অধিকার ভোগ করছি– অন্য কিছু কিন্তু ভেব না।' সে বলল, 'তোমাকে আমি একটা বাইসাইকেল কিনে দেব– একটা সোনার আংটি তুমি পাবে।' সে আমার মুখে একটার পর একটা চুমো দিতে লাগল।

অডিটর গারু এ শহরে পাঁচ মাসের একটু বেশি দিন ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে আমি এক দীর্ঘ রসাত্মক মহাকাব্য রচনা করলাম। ওই মহাকাব্যে একশ' পঞ্চাশ দিনের একশ' পঞ্চাশটা সোনালি পত্র সন্নিবেশিত হল। প্রতিটি মুহূর্ত পরিপূর্ণ ছিল স্বর্গীয় অমৃতধারায়। তার সুর লয় ছিল শিল্পকলায় ঋদ্ধ। যদিও আমার জীবন ছিল দুর্দশাগ্রস্ত, আমি যেন বেতগাছের মত নুয়ে পড়তে থাকলাম। ওই পাঁচ মাসে গাছের ডালের মৌচাকের মধু নিঃশেষ হয়ে যেতে থাকল।

আমাদের বিচ্ছেদকে একটা ট্রাজেডি হিসেবে ধরা যেতে পারে। কলেজ ছুটি হলে আমি গ্রামের বাড়ি গেলাম। কলেজ পুনরায় খুললে আমি ফিরে এসে দেখলাম যে তারা বদলি হয়ে অন্য স্থানে চলে গেছে। তারপর থেকে তাদের সম্বন্ধে কিংবা তারা কোথায় আছে সে সম্বন্ধে একটা শব্দও ব্যক্ত করলাম না। তার ভালবাসার কাঙাল হওয়ার কারণে এই বিচ্ছেদের মহাকাব্য যদি আমি বর্ণনা করি তবে তা হবে একটা রোমান্টিক বিচ্ছেদের মহাকাব্য। এই মহাকাব্য রচনা করতে পারতাম যত্ন সহকারে।

বিএ পাশ করে আমি সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় বসলাম। তারপর একটা সরকারি চাকরি পেয়ে আমার পছন্দের একটা মেয়েকে বিয়ে করলাম। বাসরঘরে কনের দিকে একনজর তাকালে তার মুখটা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। সে সময় আমার মনে পড়ল মাণিক্যাম্মা গারুর সঙ্গে আমার মিলিত হবার সেইসব দিনের কথা। আমি আমার নবপরিণীতা বধূকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম, তখনো মাণিক্যাম্মা গারুর কথা আমার মানসপটে ভেসে উঠল।

এত বছর পরে তার সঙ্গে আমার সাৰাৎ ঘটলে আমি তাকে চিনতে পারছিলাম না ভেবে ট্রেনের কামরায় আমার মাঝে একটা অস্বস্তি দেখা দিল। 'তোমার কত পরিবর্তন হয়েছে!' আমি বললাম। 'নয় বছর হতে চলল সব কিছুতেই পরিবর্তন হয়েছে। ঈশ্বরের ইচ্ছায় এতদিন পর আবার আমাদের সাৰাৎ ঘটল।'

বিএ পাশ করে আমি সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় বসলাম। তারপর একটা সরকারি চাকরি পেয়ে আমার পছন্দের একটা মেয়েকে বিয়ে করলাম। বাসরঘরে কনের দিকে একনজর তাকালে তার মুখটা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। সে সময় আমার মনে পড়ল মাণিক্যাম্মা গারুর সঙ্গে আমার মিলিত হবার সেইসব দিনের কথা। আমি আমার নবপরিণীতা বধূকে দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরলাম, তখনো মাণিক্যাম্মা গারুর কথা আমার মানসপটে ভেসে উঠল।

‘ইলুরে আমাদের দেশের গ্রামে। আমি সেখানে দোতলা একটা বিল্ডিং বানিয়েছি। তোমার ছেলে ভাগ্যবান। আমাদের দশ হাজার রৌপ্যমুদ্রা আছে। প্রতি বছর পনের হাজার নারকেল পাই, তাছাড়া অনান্য ফসল তো আছেই। আমাদের বাড়ি এসে নিজের চোখে দেখে যাও।’ সে বলল। পুরি ও কফি খেয়ে ছেলেটি বুফে কার থেকে ফিরে এল। ‘মা তুমি ফলটল খাবে না?’ ছেলেটি তার মায়ের কোলে বসে তাকে জিজ্ঞেস করল।

‘আমরা প্রায় এসে গেছি। তুমি তা হলে রোববার আসছ’, মাণিক্যাম্মা জিজ্ঞেস করল। তার চোখ দুটোতে আলো যেন ঠিকরে উঠল, তার পুরো মুখটাতে আনন্দের উদ্ভাস! সাত মিনিটের মধ্যে আমরা ইলুরে পৌঁছে গেলাম। আমি তাদের গেটের বাইরে নিয়ে গাড়িতে তুলে দিলাম। ‘মনে থাকে যেন...’, ছেলেটির মা বলল। ‘আপনি রোববার আসছেন তো?’ ছেলেটি আমাকে জিজ্ঞেস করল।

‘তুমি কোথায় যাচ্ছ?’

‘বেজওয়াদা।’

‘কেন?’

‘আমি সেখানে কাজ করি।’

‘ভালই হল। তুমি তো আমাদের কাছাকাছি থাক, তুমি বিয়ে করেছ?’ সে জিজ্ঞাসা করল।

‘আমার দুই সন্তান। দেড় বছরের একটা মেয়ে আর তিন মাসের একটা ছেলে।’

‘তাহলে তোমার স্ত্রীর দুই সন্তান। প্রকৃতপক্ষে তোমার কিন্তু সব মিলে তিন সন্তান।’

‘তিন সন্তান?’

‘হ্যাঁ, তুমি আমাকে একটা সুদর্শন সন্তান উপহার দিয়েছ।’ তার কথাটা শুনে আমি রোমাঞ্চিত হলাম।

‘এখন ওর বয়স নয় বছর। পুরোপুরি তোমার মত দেখতে। সে ফিরে এলে দেখতে পাবে। যাহোক, তুমি আমার রৰাকর্তা। তোমার স্বর্গীয় দান আমার স্বামীর উপার্জিত অর্থকড়ি ও সহায়স ম্পত্তির উত্তরাধিকার অর্জনে সক্ষম হয়েছে। তা নইলে আমার দেবর সব কিছু দখল করে অর্থকড়ি সম্পত্তি থেকে আমাকে বঞ্চিত করত।’

‘তোমরা এখন কোথায় থাক?’

‘ইলুরে আমাদের দেশের গ্রামে। আমি সেখানে দোতলা একটা বিল্ডিং বানিয়েছি। তোমার ছেলে ভাগ্যবান। আমাদের দশ হাজার রৌপ্যমুদ্রা আছে। প্রতি বছর পনের হাজার নারকেল পাই, তাছাড়া অনান্য ফসল তো আছেই। আমাদের বাড়ি এসে নিজের চোখে দেখে যাও।’ সে বলল। পুরি ও কফি খেয়ে ছেলেটি বুফে কার থেকে ফিরে এল।

‘মা তুমি ফলটল খাবে না?’ ছেলেটি তার মায়ের কোলে বসে তাকে জিজ্ঞেস করল।

নিঃসন্দেহে আমার ছেলে। পুরোপুরি আমার মত দেখতে, আমার ঔরসজাত সন্তান, আমার তখন আঠারো বছর বয়স, আর মহিলাটি আমার চেয়ে আঠারো বছরের মত বড়। আমার অজান্তেই ছেলেটির জন্ম। ছেলেটির পিতা যে আমি তা সে জানে না। আমার সন্তানটি ইলুরে গত নয় বছরে বেড়ে উঠেছে।’

‘আমার ছেলেটাকে দেখেছ?’ সে আমাকে জিজ্ঞেস করল।

‘অবশ্যই দেখেছি।’ আমি ছেলেটির দিকে তাকিয়ে থাকলাম। পুত্রের দিকে পিতৃস্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আমি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লাম। ‘এখানে এস, বাবা।’ আমি ছেলেটির দিকে তাকিয়ে আপ্লুত কণ্ঠে বলে উঠলাম। সে কোন ওজরআপত্তি না করে আমার কাছে এল। আমি আনন্দের সঙ্গে দু’হাত দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গন করলাম। মাণিক্যাম্মা গারু তার মুখ তার শাড়ির আঁচল ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ‘তুমি কোন ক্লাসে পড়, বাবা।’ আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

‘সেকেন্ড ফরমে’, ছেলেটি জবাবে বলল।

‘তুমি তার সঙ্গে কি ইংরেজিতে আলাপ করতে পারবে?’ মা ছেলেকে জিজ্ঞেস করল। ‘আমি তাকে ইংরেজি শেখার জন্য তিন বছর একজন খ্রিস্টান শিক্ষক রেখেছিলাম।’

‘আই অ্যাম বিলো টেন। এটা কি ঠিক না ভুল হল?’ ছেলেটি আমাকে জিজ্ঞেস করল।

আমি সত্যি সত্যি সমস্যায় পড়লাম। তার বাক্য শুদ্ধ কিন্তু আমি এটা ভেবে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলাম আমি ভুল না বলে ফেলি ভেবে। বিএ পাস করার সার্থকতা কোথায়? আমাদের প্রফেসররা কি আমাদের কলেজে ভাল করে শিখিয়েছিলেন? আমি মনে মনে ভাবলাম।

‘তুমি আমাকে বল, বাবা।’ আমি বললাম।

‘পুরোটাই ভুল। আপনার বলা উচিত ‘আই অ্যাম আন্ডার টেন।’ সে খিলখিল করে হেসে বলল। ছেলেটি ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ার অবস্থা হলে আমি উপরের বার্থ থেকে বিছানাটা নিচের বার্থে পেতে দিয়ে ছেলেটিকে তার উপর শুইয়ে দিলাম। আমি পাশে বসে আমার হাত তার গায়ে রাখলাম।

কৈকারাম স্টেশন না আসা পর্যন্ত আমরা এটা ওটা নিয়ে নানা বিষয়ে আলাপ করলাম। সেই মুহূর্তটা বড়ই উপভোগ্য ছিল। পরের স্টেশন পুলা– ছেলেটি নাক ডাকতে শুরু করল। তারপর ট্রেন দেলদুলু স্টেশনে পৌঁছল। দেলদুলু, ইলুরের আগের স্টেশন।

‘আমরা প্রায় এসে গেছি। তুমি তা হলে রোববার আসছ’, মাণিক্যাম্মা জিজ্ঞেস করল। তার চোখ দুটোতে আলো যেন ঠিকরে উঠল, তার পুরো মুখটাতে আনন্দের উদ্ভাস! সাত মিনিটের মধ্যে আমরা ইলুরে পৌঁছে গেলাম। আমি তাদের গেটের বাইরে নিয়ে গাড়িতে তুলে দিলাম। ‘মনে থাকে যেন...’, ছেলেটির মা বলল। ‘আপনি রোববার আসছেন তো?’ ছেলেটি আমাকে জিজ্ঞেস করল।

‘ইলুরে অবশ্যই আসছি।’ আমি জবাবে বললাম।

অনুবাদ **মনোজিৎকুমার দাস**

লেখক পরিচিতি

তেলেগুভাষার প্রখ্যাত লেখক গুড়িপতি ভেঙ্কাটাচলমের জন্ম মাদ্রাজে (অধুনা চেন্নাই) ১৯ মে ১৮৯৪; মৃত্যু: ৪ মে ১৯৭৯ অরুণাচলমে। তেলেগু গদ্যসাহিত্যে নতুন ধারার প্রবর্তক, ঔপন্যাসিক ও সমাজসং স্কারক গুড়িপতি ব্যক্তিগত জীবনে শিক্ষকতা ও শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর লেখায় নারীবাদী অনুষঙ্গের উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়; পাশাপাশি সমাজের কুসংস্কার ও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহও ঘোষিত হয়েছে। তিনি উপন্যাস, ছোটগল্প ও প্রবন্ধ রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন।। তাঁর লেখা বিখ্যাত উপন্যাসগুলোর মধ্যে মইদানম, সসিরেখা, অরুণা, তিয়াগাম, বুজ্জিগাদু, ব্রাহ্মণিকাম, অনসুয়া উলেখযোগ্য। তাঁর ছোটগল্প সংকলনের মধ্যে উলেখযোগ্য সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্, বেদান্তম্, মামাগারি, আরার্থি, মাদিগা আম্মায়ী ইত্যাদি। এছাড়াও তিনি শিশু ও নারীশিক্ষাবিষয়ক অনেক গ্রন্থ রচনা করেন।

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

রূপকথা ভূতকথা ভালবাসা

সালেহা চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

এগারো.

অনেকগুলো গাছ পাশাপাশি। কাজল এদের মধ্যে একটি প্রিয় জায়গা বেছে নিয়ে বসে। চুপচাপ চারপাশ। কখনো বই, কখনো ম্যাগাজিন, কখনো সেলাই। একটি ছড়ানো নিচু ডালে বসে কাজল উল বুনছে। সাপের ফণার মত মাফলার। ও বাড়ির সেজদি শিখিয়েছে। কয়দিন বাবার বাড়িতে খেয়ে, ঘুমিয়ে, গোলমত হয়ে আবার কলকাতা চলে গেছে সেজদি। বড় হচ্ছে এই লাল মাফলার। ঘর পড়ছে, ঘর উঠছে। আর বেড়ে উঠছে বেড়ার উপরের হেজের মত। পেয়ারা গাছে চেনা দুটো গিরগিটি আছে। মাঝে মাঝে লাল লাল পেটে কাজলকে দেখে। তারপর চলে যায় যেখানে যেতে চায়। উলবোনা থামিয়ে ওদের হেঁটে যেতে দেখে। পাতার আড়ালে লুকোয়। আবার বেরিয়ে আসবে। ওরা কাজলকে ভয় পায় না। কাজলও ওদের ভয় পায় না। রিনু, বীনু ভয় পায়।

চালতা গাছে ফুল ফুটেছে। সকালের হাত ফসকে পালানো প্রজাপতি তার উপর। না হলে তার কোন ভাইবোন। না হলে মামা চাচা। একদম একমত দেখতে। আজ ফাগুনের তিন তারিখ। শীত কমছে। কাজল বাংলা ক্যালেন্ডারে দেখেছে। এখন তেমন কনকনে ভাবটি নেই। পাতার মধ্যে প্রথম বিকেলের রোদ ঝলমল করছে।

কাজল! নাম ধরে ডাকল কেউ তাকে। প্রথম ডাকে কাজল মুখ তোলে না। দ্বিতীয় ডাকে মুখ তুলে তাকাল।

পান্নাভাই হাসি হাসি মুখে সামনে। দুপুরের ঝগড়ার কোন চিহ্ন নেই মুখে। সন্ধির ইচ্ছে প্রবল। কাজল কতক্ষণ রামগরুড়ের ছানা হয়ে থাকবে। তাই কি থাকা যায়? যেখানে অন্যপক্ষ

সন্ধি করবে বলে একেবারে বদ্ধপরিকর। রীতিমত সিরিয়াস। এ ছাড়া অন্যপক্ষের হাতে ঝুলছে একটি দুর্লভ উপহার। দুর্লভ উপহার থেকে কাজল চোখ ফেরাতে পারে না।

তখন চলে এলি যে বড়? পান্নাভাই হাসছেন ঠিক এই বিকালের মত করে। এখন ন্যাড়ামাথা বা সজারু মাথা বলা যায় না। এখন কোন কটুকথা কাজল ইচ্ছে করলেই বলতে পারবে না। কাজল অন্যকথা বলে– আর পুকুরে ঝাপানো চলবে না। মা না করেছেন।

তার মানে?

তার মানে কলঘরের তোলা পানিতে ঝাপুর ঝুপুর।

তার মানে?

তার মানে আমি বড় হয়েছি।

বড়? সত্যি নাকি? কোথায় দেখি?

পান্নার দিকে তাকিয়ে বলে কাজল– কি করে দেখবেন। চশমা আনতে ভুলে গেছেন না।

চশমা। রিডিং গ্লাসেস? সেতো পড়াশুনার জন্য। তোকে পাঠ করে নিতে আমার খালি চোখই অনেক। মানে আমার প্রেমের চোখ।

আহারে আমার প্রেমের চোখ! কাজল ভেংচি কাটে। ন্যাড়ামাথা।

পান্নাভাই রাগ করবে না, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। বলে সে– এখন আর মোটেই ন্যাড়ামাথা বলা যায় না। এখন আমি চুলওয়ালা মাথা। অবশ্য রাগ টাগ পান্নার স্বভাবজ নয়। জীবন এখনো কড়াচোখে দেখতে ভালবাসে না। হয়তো একদিন পান্নাও বদলাবে। ততদিনে কাজল কোথায় আর পান্নাভাই কোথায়।

হাত দিয়ে দেখ জুতোর ব্রাশের মত ঘন চুল।

আপনার মতে ঘনচুল নাকি সার ভর্তি মাথার ফসল। আপনি আমাকে বলেছেন। আপনার মাথাতেও ও বস্তুর অভাব নেই বলুন?

পান্না শিসে গান গায়। উত্তর ওই শিসে। অর্থাৎ তিনি এখন খুব ভালমুডে আছেন। পান্না শিসে সুর তুলতে পারে। অনেক পশুপাখির স্বর নকল করতে পারে। চমৎকার কবিতা পড়তে পারে এবং লিখতেও। এবং গল্প বলতে বসলে পারুল, কাজল, মমতা সব ভুলে যায়। কাজল সুর বুঝতে চাইল। কোন গানের সুর সেইটি। ও বুঝে ফেলে– এই পথে যাই চলের সুর এটা। আর তাকিয়ে দেখল সেই মহার্ঘ্য উপহার। তালগাছের বাবুই বাসা। বাবুইবাসাটা নিঃসন্দেহে কাজলের জন্য। কিন্তু পান্না এখনো কিছু বলছে না।

পারুল কি করছে?

ঘুমোচ্ছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আর খেয়ে খেয়ে আহ্লাদিনী বোন ফুটবল হবেন। তারপর মা একদিন ফুটবলকে পার করতে কষে ফর্সা করতে চাইবেন ওকে। মুখে হলুদ, সর, চন্দন মাখাবেন। মাখাতে মাখাতে মুখের চামড়া ছিলে যাবে। তা যাক বিয়ে তো হতে হবে বড়লোকের সঙ্গে। তারপর আমরা জাল ফেলব। আর জালে আটকা পড়বে বেশ বড় এক রুই বা বোয়াল। তোর ব্যাপার কি? দিবানিদ্রা নিষিদ্ধ।

একটু ঘুমিয়ে উঠে এই এখন সেলাইয়ে মগ্ন। ভাল লাগে না দুপুরটাকে ঘুমিয়ে খরচ করতে।

ভবিষ্যতে কবি টবি হওয়ার বাসনা নাকি?

আমি আর কবিতা। ওতো মিঠুপার জগতের ব্যাপার।

মিঠুপা প্রসঙ্গে উজ্জ্বল হয় পান্নার মুখ। বলে– ঠিক করে বলতো কি করছে তোর মিঠুপা এখন?

ওই যে আমগাছ তার নিচে একটি ঘর আছে। সেই ঘরে একটি মনোরম বেত ও কাঠের ইজিচেয়ার আছে। সেখানে বসে হয়তো পড়ছে, নয়তো গান শুনছে না হলে চোখ বন্ধ করে আপনার কথা ভাবছে।

এবারে বোঝা যাচ্ছে বাবুইবাসা প্রীতি উপহারের কথা। মিঠুপার খবর চাই। বলে– কলেজে যখন দেখা হয় জিজ্ঞাসা করতে পারেন না কোন সময় কি করে মিঠুপা।

তা হলেই হয়েছে। হাতিঘোড়া গেল তল মশা বলে কতজল?

উল বুনতে বুনতে বলে কাজল– হাতিঘোড়ারা থাকে কোথায়?

আমি কি করে বলি কোথায় থাকে। তবে আছে আশেপাশে কোথায়।

আমার মিঠুপাকে আপনার খুব পছন্দ তাই না মিস্টার এনোফেলিস? প্রেমট্রেম নয়তো?

প্রেম? তোর মিঠুপার পিউরিটান শব্দকোষে প্রেমট্রেম শব্দ কি করে প্রবেশাধিকার পাবে? মানে এমন বাজে শব্দ ওর ভাল লাগবে?

লাগবে না? তাহলে এতসব প্রেমের বই পড়ে কেন?

হয়তো সেই বিশেষ মানুষটির জন্য। যে এখনো আসেনি কিন্তু যে কোন মুহূর্তে এসে পড়বে। বড় একটা গাড়ি নিয়ে। বলবে– চল আমার সঙ্গে।

তাহলে আপনরা এতসব খোঁজে কি হবে? কি করছে তোর মিঠুপা, ঘুমোচ্ছে না জেগে, হাসছে না কাঁদছে না কি আপনার কথা ভাবছে।

আসলে খবরগুলো দরকার কবিতা লেখার কারণে।

এখন পড়াশুনা করছে। আকাশ থেকে তারা পেড়ে আনতে যা করে মানুষ। আপনার খবর কি কোনমতে তৃতীয়বিভাগ।

ওই রকমই কিছু। তারা ধরবার মতলব নেই। ফেল করলে তোর মিঠুপার সঙ্গে একক্লাশে পড়তে পারব না সেইটাই ভাবনা। এমনিতে দু'বার টাইফয়েড, একবার গাড়ি দুর্ঘটনা। এতদিনে আমার য়ুনিভার্সিটি শেষ করার কথা। আর কতদিন পড়ে থাকব একই ক্লাশে বল।

আপনারা বড়লোক। পড়াটা ছুতো। না পড়লেও হয়।

তা হয়। কিন্তু না পড়লে...। আচ্ছা সেসব থাক। তারপর খানিক চুপচাপ বসে থাকা। গিরগিটিদের ওঠানামা দেখা। পাখির কিচকিচ, পাতার ফিস ফিস আর ফড়িংয়ের দুরন্ত শিহরন দেখতে দেখতে শিষে আবার সেই নরম সুর তোলে পান্না। অনেকটা এইপথে যাই চলে ঝরা পাতা যাই দলে। বিশেষ ভাললাগা পরিচিত সুর। কাজল শোনে মন দিয়ে। ঠোঁট গোল করে অনেকবার ও শিস দেবার চেষ্টা করেছে কিন্তু হয় না। পান্না বলে প্রাকটিস করতে করতে একদিন শিস শিখে যাবি। কিচ্ছু কঠিন না। কিন্তু কাজল কোনদিন শিস দেওয়া শিখতে পারবে না। ও শুনতে শুনতে বলে– আমি কোনদিন শিখতে পারব না শিস দেওয়া।

চেষ্টা কর। পৃথিবীতে অসাধ্য বলে কিছু নেই। নে ধর এইটি এনেছি। শুনলাম আপাতত তুই নাকি এক বাবুইয়ের বাসার সন্ধানে। খুশি তো?

থ্যাংকু বলে কাজল। আমি কি করব জানেন?

কি করবি?

ওর পেটের ভেতর রেখে দেব একটি জীবন্ত জোনাকি। তারপর রাতে যখন জোনাকি জ্বলবে মনে হবে খড়ের ঘরে বাতি জ্বলছে। মজা

না?

ভীষণ। ইনজিনিয়াস ভাবনা। এইসব অভাবনীয় বুদ্ধিগুলো কি পারুলকে ধার দিস? ওকেও দেখেছি কি যেন করছে ও জোনাকি ও জুতোর বাক্স নিয়ে। তোরা না এক একটা মস্ত বিজ্ঞানী।

কাজল হাসে। – আর আপনি 'রেনম্যান'। শিসে বিষ্টি আনতে পারেন।

বিষ্টি পড়ে হৃদয় জুড়ে/ আকাশ পারে মাঠের পরে/ কাজলমেয়ের এই হৃদয়ে।

কাজল হাসে আবারও– আমাকে পদ্যটদ্য শুনিয়ে লাভ কি? আমি এমনিতেই 'রেনম্যানের' ভক্ত।

আমি চলিলাম ভক্ত। বাবা তলব করেছেন। বলেছেন– পানাউল হক এবার তুমি বিষয়বুদ্ধি বুঝিয়া লও। পরীক্ষার পরেই। তাকে এখন গিয়ে ভালমত বোঝাতে হবে ওসব বিষয়বুদ্ধির ব্যাপার এখন নয়। আর আব্বাজানের আলকাতরা ও টিনের দোকান সামলাতে আমাকে আরো কয়েকবছর সময় দিতে হবে। তাঁর তেলের দোকান আমি ছাড়াও আপাতত ঠিকই চলবে।

পান্না চলে গেল।

কাজল বাবুইয়ের বাসা হাতে আনন্দে অভিভূত। পান্না বলে– যে এত তুচ্ছ উপহারে এমন খুশি হয় তার জীবনে কষ্ট আসতেই পারে না। সত্যিই কি তাই হবে? কষ্ট ওর কাছেই আসবে না কোনদিন। কষ্ট? এখনো ভাল করে কষ্ট বোঝে না কাজল। বোঝে কেবল পা কেটে গেলে না হয় একটু রক্ত ঝরলে পড়ে টড়ে গিয়ে। পান্না কি কেবল এই জানতে এসেছিল এই বিকেলে মিঠু কি করছে। পান্না কি প্রেমে ভাসছে? থাক ওসব ভেবে কাজলের কি হবে? পান্না বলে– চাঁদ দেখা যায় বলে তাকে ধরা যায় এমন যে ভাবে আমি তাদের দলে। তারপর দুই লাইন কবিতা বলে পান্না– ঘর থাইকা বাহির হইয়া জ্যোৎস্না ধরতে যাই/ হাত ভর্তি চাঁদের আলো/ ধরতে গেলেই নাই। ভারি ভাল লাগে কাজলের এই দুই লাইন। ওরও মনে হয় জোছনাকে কখনো মুঠো করে ধরা যায় না।

একদিন ও পারুল আর পান্না বনে হারাবে। এখনো এখানে বন আছে। কতদিন থাকবে এইসব গাছেদের দেশ? হয়তো মুছে যাবে সময়ে। ভরে যাবে বড় বড় দালানে। যতদিন না হয় কাজলপান্নাদের জন্য ভাল। পৃথিবীর সকল রহস্য নিয়ে যারা ভাবে। আর রহস্যের কারণে ঝোপ বন গাছ। পান্নাদের 'নির্ঝর' আর ওদের 'নিরিবিলি'।

নিরিবিলিনির্ঝরে মিলে কি না করা যায়। কাজল চেয়ে দেখে ভারি শান্তভাবে বিকালবেলা নেমেছে ওর চারপাশে। তারপর কাঁঠাল আর সফেদা গাছে। তারপর বাড়িতে। চা খাবে সকলে। তেলেভাজা মুড়ি আর চা না হলে চিঁড়ে ভাজা আর চা। সঙ্গে বাদাম থাকলে খেতে আরো মজা।

ভালোমেয়ের ডেফিনিশন অনুযায়ী মিঠুপা কোনদিনই পান্নার সঙ্গে প্রেম করবে না। মিঠুপা অপেক্ষা করছে সেই রাজপুত্রের জন্য যে চাকরি করে এবং যার বয়স মিঠুপার দ্বিগুণ। আঠারো আর বাইশ নয়। আঠারো আর ছত্রিশ। যে গম্ভীর, মোটাসোটা, গানের বদলে রাজনীতির খবর শোনে তেমনি কেউ। মিঠুপা যার পায়ের জুতো খুলে দেবে আর দাঁড়িয়ে থাকবে এরপরের আদেশের জন্য। যার কণ্ঠস্বর ভীমের মত, এমনি কেউ।

মিঠুপা যখন রাগ করে না খেয়ে থাকবে (যা সে এখানে প্রায়ই করে) তখন কি সেই ছত্রিশের মোটা মানুষটি খেয়াল করবে? হয়তো করবে না। তারপর মিঠুপার পেটে আলসার হবে। মিঠুপার ক্যানসার হবে। মিঠুপা একদিন স্বামীর কোলে মাথা রেখে মারা যাবে। সকলে বলবে– পুণ্যবতী স্বামীর আগেই চলে গেল। কাজল এইসব ভাবতে ভাবতে উঠে দাঁড়ায়। মিঠুপা এসব শুনলে বলবে– তোর এই অদ্ভুত ভাবনাগুলো কাগজে লিখলেই গল্প। কাজল মনে মনে ভাবে ও একটি গল্প লিখবে 'হে মিঠুপা তোমার ভবিষ্যৎ'। কিন্তু মিঠুপাকে ক্যানসারে মেরে ফেলতে ইচ্ছে করে না। সে গল্পে ও মিঠুপাকে মেরে ফেলবে না তবে একটু ভোগাতে পারে। এখন ঠিক বুঝতে পারছে না কি করবে। মিঠুপার ছেলেবেলা নেই। যে দশবছর বয়স থেকেই ভালমেয়ে তার ছেলেবেলা থাকে না, মেয়েবেলাও নয়। তার থাকে নারীবেলা। মিঠুপাকে নিয়ে আর একটি গল্প লেখা যায় 'রামগরুড়ের ছানা ও আমার মিঠুপা'। ভাগ্যিস কল্পনা কেউ শুনতে পায় না। না হলে সারা পৃথিবীতে ভাবনার ট্রাফিকজ্যাম হত। কি যে মুশকিল হত তখন।

বাড়িতে ঢুকতেই মিঠুপা বলে– নাও মাথা পেতে বস চুলটা বেঁধে দেই। আর হাত পা ধুয়ে পায়ে ক্রিম লাগাও। ঘুঁটেকুড়োনিদের মত পায়ে খড়ি উঠছে যে।

মিঠুপা চুলবেঁধে মুখ ধুয়ে মুখে ক্রিম পাউডার ঘসে একেবারে ফুলবানু। কপালের মাঝখানে একটি ছোট কুমকুমের টিপ। কাজল মিঠুপার কাছে দাঁড়িয়ে ট্যালকম পাউডারের গন্ধ পায়। তারপর মিঠুপার হাতের কাচের চুড়িতে একটু রিনটিন শব্দ তুলে বলে– সাজলে খুব ভাল লাগে তোকে মিঠুপা।

এক টুকরো দুর্লভ ছবি মিঠুপার হাসিতে। মিঠুপা ওর চুলগুলো ওলোটপালোট করতে করতে বলে– সাজলে তোকেও। এরপর দু'জনে হাসে।

বারো.

ফাল্গুন যাব যাব করছে। জানা গেল শুক্রবার সকাল দশটার ট্রেনে বুবু আসবেন। স্কুলে যাওয়ার প্রশ্ন নেই। আব্বার সঙ্গে স্টেশনে গেল কাজল বুবুকে আনতে। গতকাল ওদের আসার খবর দিয়ে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন দুলাভাই। পোস্টমাস্টার দুলাভাই সুযোগ পেলেই টেলিগ্রাম করেন। তার নিজের পক্ষে এইসময় আসা সম্ভব নয়। দুলাভাইয়ের ছোটভাই এসেছেন। বাপের বাড়িতে বুবুকে তার তিন মেয়েসুদ্ধ নিয়ে আসার দায়িত্বে বেশ একটু গম্ভীর। বেশ দায়িত্ববান দায়িত্ববান ভাব।

ট্রেন থেকে নামতেই একরাশ পাখির আনন্দে ওরা ছড়িয়ে পড়ে পাটফর্মে। রীনু, বিনু ও চুমকি। গোলাপি সুঁচের কাজ করা জামা গায়ে তিন মেয়ে নামে। জামাগুলো বুবুর নিজের হাতের বানানো।

সুনামগঞ্জ কলেজে ভর্তি হয়ে সুনাম হয়ে এসেছে বুবুর ছোট দেওর। সেও দাঁড়িয়ে আছে মালপত্রের সঙ্গে। বুবুর সীবনী দৰতা জামায়, সুঁচের কাজে। মাথায় ফিতের ফুল। টলমল পায়ে নয় বেশ গুটগুট করে হাঁটছে চুমকি। রীনু অনেক লম্বা হয়েছে। বীনুও তাই। চুমকিকে কোলে তুলে নিল কাজল। – ছোটখালা! রীনু বীনু একসঙ্গে ডাকে। ভাবখানা এই আমিও আছি। সবগুলোই পুতুল পুতুল। গাড়িতে কি সব খেয়ে জামায়

রিকশায় উঠেই রীনু বক বক শুরম্ন করেছে। ওদের বাড়ির গল্প। পাশের বাড়ির গল্প। বেড়ালের গল্প। উঠোনের মোরগ ফুল ও গাঁদা ফুলের গল্প– কত কি। পাশের বাড়ি মিমি ও মৌমিতার সঙ্গে আসার আগের দিন আড়ি দিয়েছে। গিয়ে ভাব করবে। টুসি খড়ির ঘরের চোকির নিচে তিনটে বাচ্চা দিয়েছে। তিনটেই সাদা-কালো। ওরা ডাকে কালো, ধলো আর বাকুম বলে। বাকুমটার সারা গা ডোরা ডোরা। গল্প শুনতে শুনতে হেসে ওঠে কাজল। – এমা বেড়ালের নাম বাকুম হয় নাকি। বাকুম তো পায়রার নাম। রীনু বলে– আমি ইচ্ছে করেই রেখেছি।

মুখে একটু দাগ লাগিয়েছে। না হলে ঝকঝকে পুতুল। রীনু বিনুকে বুকের কাছে নিয়ে আদর করে ঠিক খালার মত। এখন কেউ তাকে মোটেই ছোট মেয়ে বলতে পারবে না। বুবুর কাছে সরে আসে কাজল। বুবু ওকে আদর করেন। বলেন বেশ একটু লম্বা হয়েছিস মনে হয়। আব্বা ও শাহেদ নামের সুনামগঞ্জের সুনাম মালপত্র গোছগাছে ব্যস্ত। রিকশা ঠিক করছে। তিনটে রিকশার দরকার। এর আগে বুবু আব্বাকে সালাম করেছে। আর শাহেদও। – থাক থাক ওকি হচ্ছে! এই বলে আব্বার কণ্ঠ ভারী। তারপর আবার রিকশা ও মালপত্রের তদারকিতে ব্যস্ত। তালুইআব্বাকে ব্যস্ত হয়ে সাহায্য করছে শাহেদ। – আ তুমি জামাইয়ের ছোটভাই? বেশ বেশ। এই বলে আব্বা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন যাওয়ার ব্যবস্থা করতে। শাহেদ বিনীত ছেলে। কাজলকেও দেখছে আড়চোখ। স্পষ্টভাবে নয়। অমন করে কেউ দেখলে কাজলের ভাল লাগে না। স্পষ্ট করে সে তাকায় সকলের মুখের দিকে। অবশ্য স্কুলে যখন পড়া না দিতে পারে তখন নিজের পা ছাড়া আর কোন দিকে তাকায় না। শাহেদের ট্রাউজারের উপর বুবুর হাতে-বোনা হাতকাটা সোয়েটার। মুখটি দাড়ি-গোফে ঘন নয়। বেশ একটু ফিনফিনে। কাজল কিছু বলে না। ছেলেটা যে মোটেই পান্নাভাইয়ের মত নয় তা কাজল বুঝতে পারে।

আলিপুরে যেতে রিকশায় সময় লাগে। স্টেশন কাছে নয়। রীনু বিনু ও কাজল এক রিকশায়। বুবু ও চুমকি একটিতে। আর আব্বা ও শাহেদ একটিতে। বুবু আসন্ন সম্ভাবনায় গোলমত। রাস্তায় পান খাওয়া হয়েছে তারই স্বাক্ষর ঠোঁটে। বুবু কখনো ঠোঁট লাল করে না লিপস্টিকে। শাহেদও পান খেয়েছে বোঝা যায়। সিগারেট লুকিয়ে খায়। তাইতে ঠোঁট কালো।

রিকশায় উঠেই রীনু বক বক শুরম্ন করেছে। ওদের বাড়ির গল্প। পাশের বাড়ির গল্প। বেড়ালের গল্প। উঠোনের মোরগ ফুল ও গাঁদা ফুলের গল্প– কত কি। পাশের বাড়ি মিমি ও মৌমিতার সঙ্গে আসার আগের দিন আড়ি দিয়েছে। গিয়ে ভাব করবে। টুসি খড়ির ঘরের চোকির নিচে তিনটে বাচ্চা দিয়েছে। তিনটেই সাদাকা লো। ওরা ডাকে কালো, ধলো আর বাকুম বলে। বাকুমটার সারা গা ডোরা ডোরা। গল্প শুনতে শুনতে হেসে ওঠে কাজল। – এমা বেড়ালের নাম বাকুম হয় নাকি। বাকুম তো পায়রার নাম। রীনু বলে– আমি ইচ্ছে করেই রেখেছি। আমাদের পায়রাগুলোও বাচ্চা দিয়েছে। আসার আগে মা দুটো রান্না করেছিলেন।

ইস। কাজল বলে– কি করে যে মানুষ পায়রার বাচ্চা খায়?

আমারও তাই মনে হয়। বলে রীনু।

আমারও। বলে বিনু।

আমাদের বাড়িতে পায়রা নেই। আর থাকলেও আমি জানি আব্বা ওসব বাচ্চা খেতে দিতেন না।

রীনু বড় মেয়ে। বাড়ির অনেক কাজ ও করে। আব্বাকে নাস্তা দেওয়া। মোজা গোছানো আরো কত কি।

আমি সার্টে বোতামও লাগাতে পারি। বলে রীনু।

তুই না দেখতে মিঠুপার মত। আর তাই কাজও করিস মিঠুপার মত। তবে এবারে তোদের বেশির ভাগ সময় আমার সঙ্গে কাটাতে হবে। মিঠুপা পরীক্ষা নিয়ে ব্যস্ত। ভাল লাগুক আর না লাগুক। কাজল বলে।

খুব ভাল লাগবে। বিনু জানায়। তুমি ছোটখালা কতসব গল্প জানো। ভূতের গল্প। আরো কত কি?

ভূত হতেও পারি। কাজলের কথায় হাসে সকলে। কাজল বিনুর চুলের ফিতে খোলে আর বাঁধে। বলে– বাবার জন্য মন খারাপ লাগছে না বেড়ালের জন্য?

আমার কালো ধলো আর বাকুমের জন্য একটু চিন্তা হচ্ছে।

আমি বাবার ওজুর পানি থেকে আরম্ভ করে সব কিছু করি। তাই ভাবছি বাবা সবকিছু ঠিকমত করতে পারবে কি না।

দুলাভাই ঠিকই সবকিছু চালিয়ে নেবেন। তুই নানার বাড়িতে এসেছিস মজা কর, ওসব কর্তব্যকর্ম ভুলে যা। মিঠুপা তোদের জন্য জামা বানিয়ে রেখেছে ওর এই সব পরীক্ষার ভেতরেও। টেপজামা অবশ্য। কিন্তু খুব সুন্দর দেখতে। ওতো আবার ক্রুশকাঁটায় মহা ওস্তাদ। এরপর কাজল একটু আলগোছে বসা বিনুকে খুব কাছে টেনে চেপে ধরে। পাশের রিকশা চলে গেল আব্বা ও শাহেদকে নিয়ে। দু'জনে রাজনীতি না সমাজনীতির মত বিষয়ে আলোচনা করছে। পেছনের রিকশার চুমকি বলছে বুবুকে– মা ওই পাখিটার কি নাম।

বোধকরি ধনেশ। বলেন রেবাবু। কাজল পর্দা তুলে একবার পেছনে তাকায়। তারপর চুমকি ও বুবুর রিকশা টেকঅভার করে ওদের। মনে হয় এই তিন রিকশাওয়ালা প্রতিযোগিতা শুরু করেছে। একে অন্যকে অতিক্রম করবার প্রতিযোগিতা।

তেরো.

বারান্দায় মা ও মিঠুপা। এগারোটার নিরিবিলি রোদে ভাজা ভাজা। পাখিরা নেই কোথাও। হয়তো লুকিয়ে কোথায়। চেনা কাঠবেড়ালি এখন বেরিয়ে আসবে না। সময়ে সব চিনে নেবে রীনু বিনু। পাখি প্রজাপতি কাঠালিচাঁপা এবং অন্যান্য আর সব গাছের নাম।

রাবেয়া। মাকে জড়িয়ে রেবাবু চোখ মোছেন। মা কাঁদবে সে কথা কাজল জানে। কেউ গেলে কিম্বা কেউ এলে মা কাঁদেন। মিঠুপার দিকে তাকিয়ে বুবুর চোখ জুড়িয়ে গেল। কি স্নিগ্ধ আর শান্ত একটি মেয়ে হয়েছে মিঠু। বুবু মাকে সালাম করে। মিঠুপা অমনি কিছু করতে গেলে বুবু ওকে বুকে জড়িয়ে নেয়। – মা তুমি রোগা হয়েছ। মা বলেন– অনেকদিন পর দেখলিতো তাই। তারপর মিঠুপার দিকে চেয়ে বলে– বা কি মিষ্টি লাগছে তোকে মিঠু। মিঠুপা হাসে। চুমকিকে কোলে তুলে নেয়। টুকটুকে লাল বাউজ আর আকাশনীল শাড়ি পড়েছে মিঠুপা। বড় বেণীটা ঝুলছে। এইতো। তাইতেই অপরূপ। বুবু মিঠুপাকে জড়িয়ে বলে– পড়াশুনার সময় এলাম। তোর পড়া আবার বাদ দিস না।

সে নিয়ে ভাববে না। আমি ঠিকই পড়াশুনা করব।

কাজল শুনছে আর দেখছে এসব। ও নিশ্চয়ই আগের মত আছে। তাই এসব প্রশংসা নেই। আর তাইতেই বুবু চোখ ফিরিয়ে বলে– তোর এখন লম্বা হওয়ার বয়স সুন্দর হওয়ার নয়।

বললেই হয় আমি আগের মত পচাই আছি।

সকলে হাসে। বুবু বলেন– চুল বড় হয়েছে। আর রংটা কি বাপু রোদে ঘুরে ঘুরে এমন করলি?

মা বলেন– চল চল সকলে একটু বস আগে। নারিকেল নাড়ু আর

কাজল ওদের দু'জনকে কাছে টানে। আদর করে। রীনু হালকা পলকা। বিনু সর খাওয়া পারুলের মত। গোলগাল। তবে পারুলের মত এত বেশি নয়। রীনুর মুখ একটু লম্বা মত। বিনুর চাঁদের মত গোল। আর কাজলের মুখের শেপ? মমতা বলে পানপাতার মত। আয়নায় দেখলে কাজলের মনে হয় ওর মুখের কোন শেপই নেই। একবার চারকোনা একবার গোল এবার লম্বা। এর ভেতর পানপাতা যে কোনখান থেকে মমতা পায় কাজল বুঝতে পারে না। মমতার মুখ গোল। মমতার চোখে ওর মুখের শেপ পানপাতার মত।

বরফির ভোজ হবে। এগারোটায় ভাত খাবে না কেউ। হাঁড়িতে মিষ্টি। বুবু এককাপ চা খাবে। আর ছোটরা কেওড়া মেশানো সরবত না হলে কমলার রস। মা কমলার রস না খাইয়ে ছাড়বেন না কাউকে। ভিটামিন আছে কমলায় এ খবর মার জানা। মনে মনে ভাবে কাজল সকালে চিরতার সময়ে কি করবে রীনু বিনু? কাজল অবশ্য হাওয়া হতে পারে। কিন্তু মুশকিল ও হাওয়া হলে এরাও হাওয়া হতে চাইবে। বোধকরি দায়িত্বের কারণে এবার মা ওকে সোনালি রংয়ের চিরতার পানি খাওয়াতে পারবেন।

আব্বা এসেছেন আসরে। বললেন– করছ কি খাবার টাবার দাও। বুবু বলে, আব্বা আপনি ব্যস্ত হবেন না আমরা সারাপথ খেতে খেতে এসেছি। তাতে কি রক্ষা পাবে কেউ। সকলকে পেটপুরে খেতে হবে। দুপুরের খাবার সে তো বেলা দুটোয়।

দুপুরে সকলে এক একজন এক একটি কৈ মাছ পাতে পেল, এর সঙ্গে শর্ষে ইলিশ ভাত খেয়ে নিজ নিজ ঘরে চলে গেলে কাজল রীনু বিনুকে নিয়ে ছাদে ওঠে। কাজলের পুরো জগত এখন ছাদের ঘরে। যেখানে এখন একটি বাবুই বাসা দুলছে দড়িতে। নকল হিরে মোতির অলংকার তোষাখানায়। কাঁথা চাদর গায়ে সবগুলো পুতুল শুয়ে আছে। কারো মাথায় রাংতার মুকুট। এদের কেউ রাজা কেউ রানী সেই কারণে। রীনু বিনু তাকিয়ে। বলে রীনু– তুমি বুঝি এখনো পুতুল খেল ছোটখালা।

ঠিক খেলি না। সাজাই গোছাই। ফেলতে মায়া লাগে। ছোট ছোট জামা বানাই। মালা গাঁথি পুতিতে। তোদেরও মজা লাগবে।

কে বানায় এগুলো?

আমি। পাশের বাড়ির মমতাও বানাতে পারে। তবে ওর বাড়িতে জায়গা কম। অতসি পুতুলের বাক্স রেখে দেয় চোকির নিচে।

অতসি?

অতসি মমতার বোন। রীনুর সমান। দেখবি ওদের সঙ্গে ভাব হবে খুব। মমতাখালাও কত কিছু করবে তোদের জন্য দেখিস।

তোমার ছেলেমেয়েরা বড় শান্ত ছোটখালা।

সাতচড়ে রা নেই। তাইতো ফেলতে পারি না। বলে কাজল মুঠো করে কয়েকটিকে ধরে চুমু খেয়ে। বলে– ইচ্ছে হলে কাপড় পরাই না হলে লাংটো করে রাখি। এরপরে হাসে তিনজন। বলে রীনু– তুমি অসভ্যকথা বললে কেন?

বেশ করলাম। গিয়ে আবার মিঠুপা বা তোমাদের মাকে বোলো না। এ রাজত্ব আমার। এখানে যা ইচ্ছে তাই বলি, যা ইচ্ছে তাই করি।

তারপর ওরা গিয়ে দাঁড়ায় ছাদের কার্নিশের কাছে। পেয়ারা গাছ ডালপালা মেলে দিয়েছে ছাদে। যেখান থেকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে পেয়ারা খাওয়া যায়। নারকেলগাছ কচি ডাবে পূর্ণ। কাজল বলে– লোক এনে মা ডাব পাড়িয়ে তোদের খাওয়াবেন। ওই দিকের গুলো বড় হয়েছে। কচি শাঁসে ভরে আছে। পাখিরা কিচ কিচ করছে। কাজল বলে– ওরা সব আমাকে চেনে। রীনু বিনু পাখি দেখছে গোল গোল চোখে। কাজল ওদের দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে পাখিদের আসাযাওয়ার কথা ব লে। আরো সব ঘটনা। পাখির, কাঠবেড়ালির, গাছের, ঘাসের– এমনি নানা ঘটনায় ওদের দুপুরবেলাকে নিরিবিলির নিসর্গে হাত ধরে নিয়ে গেল কাজল। ওরা শুনতে শুনতে বলল– ছোটখালা তুমি না খুব মজার জগতে বাস কর।

তোদের জগতটাও মজার। কিন্তু জানতে হবে মজাটা কোথায়।

তুমি জানো?

না হলে সারাদুপুর কেন আমি কোন কোনদিন ছাদে থাকি? আমি দুপুরে ঘুমাই না।

আমরা পড়ি। মাঝে মাঝে ঘুমাই। মা ঘুমায়। বাবা পোস্টঅফিসে থাকেন। বলে রীনু।

তোমাকে পাখিরা কি চেনে?

মনে হয়। গোল চোখে আমাকে দেখে। ঋতুতে ঋতুতে পাখিরা রং বদলায়। ঋতু কটা রীনু?

ছ'টা। বলে রীনু।– এখন কোন ঋতু?

বসন্ত। এই তো সেদিন আমরা টিকা নিলাম। চিকেনপক্স হতেও পারে।

চিকেনপক্সের আবার ঋতু লাগে নাকি? বলে কাজল। গতবছর হেমন্তে আমার ওপর ভর করেছিল। তোদের হয়েছে?

না।

দেখ দেখ কাজল চিৎকার করে। এই পাখিটা নতুন। কোনদেশ থেকে যে উড়ে এসেছে কে জানে। গলার কাছে নীল। এর নাম বোধহয় নীলকণ্ঠ পাখি। কাজল বলে– ইস আমার যদি ডানা থাকত।

তুমি পাখি হতে চাও?

ক্ষতি কি। বিনা টিকিটে দেশ থেকে দেশান্তর।

আমি পেনে একদিন সারা পৃথিবী দেখব। বলে রীনু। এমন করে বলে এর মধ্যে কোন মিথ্যে নেই। কাজল বলে– অনেক বড় হলে আর অনেক টাকা হলে তারপর না?

তারপর। বলে রীনু। কাজল বুঝতে পারে রীনু মোটেই একটি ছোট পুতুল নয়। ওদের দু'জনের মাঝখানে কাজল এখন ওদেরই বয়সী। একজন দশ, একজন আট আর কাজল ছয়মাস পরে পনেরোতে পড়বে। অবশ্য মা বলবেন লোকদের তেরো টেরো এইসব। কিন্তু কাজল জানে ওর আসল বয়স কত হবে। স্কুলে ছয়মাস কম। সবারই স্কুলে কম থাকে বয়স। তবে ওর মাত্র ছয়মাস কম।

রীনু জানায়– সুনামগঞ্জে এমন ছাদ নেই।

কাজল ওদের দু'জনকে কাছে টানে। আদর করে। রীনু হালকা পলকা। বিনু সর খাওয়া পারুলের মত। গোলগাল। তবে পারুলের মত এত বেশি নয়। রীনুর মুখ একটু লম্বা মত। বিনুর চাঁদের মত গোল। আর কাজলের মুখের শেপ? মমতা বলে পানপাতার মত। আয়নায় দেখলে কাজলের মনে হয় ওর মুখের কোন শেপই নেই। একবার চারকোনা একবার গোল এবার লম্বা। এর ভেতর পানপাতা যে কোনখান থেকে মমতা পায় কাজল বুঝতে পারে না। মমতার মুখ গোল। মমতার চোখে ওর মুখের শেপ পানপাতার মত।

তিনজনা ছাদের আলো দেখতে দেখতে আবার পুতুলের সংসারে আসে।

• পরবর্তী সংখ্যায়

সালেহা চৌধুরী
প্রবাসী কথাসাহিত্যিক

রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প

পুনর্কথন **ড. দুলাল ভৌমিক**

ভূমিকা

সংস্কৃত সাহিত্যে গল্প অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি শাখা। নৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি বিষয়ে গল্পের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এ সাহিত্যের সৃষ্টি। শিশু কি শোরযুবব ৃদ্ধ সব বয়সের মানুষই এ থেকে শিক্ষালাভ করতে পারে। মানুষের পাশাপাশি মনুষ্যেতর প্রাণী, এমনকি জড়বস্তুও এতে চরিত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সহজসরল ভাষায় এমন আশ্চর্য ভঙ্গিতে গল্পগুলো রচিত যে, অতি সহজেই সেগুলো পাঠকচিত্ত আকর্ষণ করে।

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের সবচেয়ে প্রাচীন ও সার্থক গ্রন্থ হচ্ছে পঞ্চতন্ত্র। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক কিংবা তার কিছু পরে বিষ্ণুশর্মা এটি রচনা করেন। এর অনুকরণে পরবর্তীকালে নারায়ণ শর্মা রচনা করেন হিতোপদেশ। এছাড়া আরো কয়েকটি বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ হল গুণাঢ্যের বৃহৎকথা, বুদ্ধস্বামীর বৃহৎকথা শ্লোকসংগ্রহ, ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী, শিবদাসের বেতালপঞ্চবিংশতি, দণ্ডীর দশকুমারচরিত, সোমদেব ভট্টর কথাসরিৎসাগর ইত্যাদি। এগুলো ছাড়া আরো একটি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হচ্ছে দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা। এটি মহাকবি কালিদাসের রচনা বলে কথিত হয়। সে হিসেবে এর রচনাকাল খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতক। এই দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাই রাজা বি ক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প নামে বাংলা ভাষায় নতুনভাবে উপস্থাপিত হল।

দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকার গল্পগুলো রাজা বিক্রমাদিত্যকে নিয়ে রচিত। তাঁর বিভিন্ন গুণের কথা এতে বর্ণিত হয়েছে।

বিক্রমাদিত্যরা ছিলেন দুই ভাই। অগ্রজ ভর্তৃহরি– উজ্জয়িনীর রাজা। একদিন তিনি অনুজ বিক্রমাদিত্যকে রাজ্যভার অর্পণ করে বানপ্রস্থ গ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্য রাজ্যের সকলকে পরম সমাদরে পালন করে সকলের প্রিয়ভাজন হন।

একদিন প্রত্যুষে এক দিগম্বর সন্ন্যাসী আসেন তাঁর কাছে। তিনি মহাশ্মশানে এক মহাহোম করবেন। তাই যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে তার ব্যবস্থা গ্রহণে রাজাকে অনুরোধ করেন। বিক্রমাদিত্য সর্বপ্রকারে সন্ন্যাসীকে সাহায্য করেন এবং সন্ন্যাসী অত্যন্ত প্রীত হন। তাঁর আশীর্বাদে বিক্রমাদিত্য বেতালসিদ্ধ হন। বেতাল হল প্রেতাত্মা এবং সর্বকাজে পারদর্শী।

এদিকে ঋষি বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যায় রত। তাঁর ধ্যান ভঙ্গ করতে হবে। এ্কা জে কে সমর্থ– রম্ভা না উর্বশী? দেবরাজ ইন্দ্র মহাচিন্তায় পড়লেন। দেবর্ষি নারদ বললেন: এ ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত দিতে পারেন একমাত্র রাজা বিক্রমাদিত্য।

দেবরাজের নির্দেশে তাঁর সারথি মাতলি পুষ্পকরথ নিয়ে মর্তে বিক্রমাদিত্যের নিকট হাজির হলেন। মাতলির মুখে সব শুনে বিক্রমাদিত্য রথে চড়ে স্বর্গে গেলেন– দেবরাজের সভায়। সেখানে শুরু হল রম্ভাউর্ ́শীর নৃত্য গীতের প্রতিযোগিতা। কেউ কম নন। তবে বিক্রমাদিত্যের সূক্ষ্ম বিচারে উর্বশী অধিকতর যোগ্য বলে বিবেচিত হলেন।

দেবরাজ ভীষণ খুশি হলেন বিক্রমাদিত্যের বিচারের ৰমতা দেখে। তাই পুরস্কারস্বরূপ তিনি বিক্রমাদিত্যকে মণিমাণিক্যখচিত একটি ব হুমূল্য রত্নসিংহাসন উপহার দিলেন। বিক্রমাদিত্য সিংহাসন নিয়ে রাজ্যে ফিরে এলেন এবং কোন এক শুভদিনে শুভক্ষণে সিংহাসনে উপবেশন করলেন। আর সুখে প্রজাপালন করতে লাগলেন।

হঠাৎ একদিন রাজ্যে ভীষণ বিপদ দেখা দিল। ধূমকেতুর উদয়, ভূমিকম্প, অগ্নুৎপাত, প্রলয়ঝড়– কোনটাই বাদ নেই। রাজা এর কারণ জানতে চাইলেন। তিনি দৈবজ্ঞদের ডাকলেন। তাঁরা বললেন: সন্ধ্যাকালে ভূমিকম্প হলে কিংবা অগ্নুৎপাত পীতবর্ণযুক্ত হলে রাজার প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দেয়।

একথা শুনে রাজার তখন অতীতের একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে গেল। তিনি একবার মহাশক্তির সাধনা করেছিলেন। সাধনায় তুষ্ট হয়ে দেবী তাঁকে বর দিতে চাইলেন। রাজা অমরত্বের বর চাইলেন। দেবী বললেন: জগতে কেউ অমর নয়। তবে একমাত্র আড়াই বছরের কন্যার গর্ভজাত পুত্রের হাতেই তোমার মৃত্যু হবে।

বিক্রমাদিত্যের একথা শুনে দৈবজ্ঞরা বললেন: কোথাও আড়াই বছরের কন্যার পুত্র জন্মেছে কিনা তা অনুস ন্ধান করা প্রয়োজন।

বিক্রমাদিত্যের নির্দেশে বেতাল অনুসন্ধানে বের হল। কিছুদিনের মধ্যেই সে সঠিক খবর নিয়ে ফিরে এল। প্রতিষ্ঠা নগরে শেষনাগের ঔরসে আড়াই বছরের কন্যার গর্ভে এক পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছে। নাম তাঁর শালিবাহন। তিনি এখন কৈশোরে পদার্পণ করেছেন।

বেতালের কথা শুনে রাজার কপালে চিন্তার রেখা দেখা দিল। তিনি আর বিলম্ব না করে তরবারি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। শালিবাহনের সঙ্গে তাঁর ভীষণ যুদ্ধ হল। কিন্তু ভবিতব্য অনুযায়ী এই শালিবাহনের হাতেই বিক্রমাদিত্যের মৃত্যু হল।

বিক্রমাদিত্য ছিলেন অপুত্রক। তাই তাঁর সভাপ-তি বললেন: অনুসন্ধান করা হোক রাজার কোন রানি অন্তঃসত্ত্বা কিনা।

অনুসন্ধানে জানা গেল– রানিদের মধ্যে একজনের গর্ভসঞ্চার হয়েছে। তখন সেই গর্ভস্থ সন্তানের নামে পারিষদবর্গ রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন। দেবরাজ প্রদত্ত সিংহাসনটি শূন্যই পড়ে রইল।

কিছুদিন পরে পারিষদবর্গ এক দৈববাণী শুনতে পেলেন: যেহেতু এই সিংহাসনে বসার উপযুক্ত কেউ নেই, সেহেতু একে একটি পবিত্র স্থানে রাখা হোক।

দৈববাণী অনুযায়ী পারিষদবর্গ সিংহাসনটিকে একটি পবিত্র স্থানে রেখে দিলেন। কালক্রমে একদিন সিংহাসনটি মাটির নিচে চাপা পড়ে গেল। সবাই ভুলেই গেল যে, এখানে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ঐতিহ্যবাহী রত্নসিংহাসনটি ছিল। সেই জায়গাটি এখন কৃষিৰেত্র এবং এক ব্রাহ্মণ চাষির দখলে। তিনি ঐ জায়গায় একটি মাচা তৈরি করে তার উপর বসে খেত পাহারা দেন।

একদিন ঘটল এক অলৌকিক ঘটনা। ব্রাহ্মণ মাচার উপরে বসে আছেন। এমন সময় মহারাজ ভোজ সসৈন্যে ওর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। ব্রাহ্মণ বিনয়ের সঙ্গে বললেন: মহারাজ! আপনি আমার অতিথি। আপনার অশ্বগুলো ক্ষুধার্ত, পরিশ্রান্ত। ওগুলোকে আমার খেতে ছেড়ে দিন। ওরা যথেচ্ছ আহার গ্রহণ করুক।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে রাজা থামলেন এবং সৈন্যদের বললেন অশ্বগুলোকে ছেড়ে দিতে। সৈন্যরা তাই করল এবং অশ্বগুলো যথেচ্ছ খেতের ফসল খেতে লাগল।

এমন সময় ব্রাহ্মণ মাচা থেকে নেমে এসে আর্তস্বরে চিৎকার করে বলতে লাগলেন: একি করছেন, মহারাজ! রাজা হয়ে প্রজা পীড়ন করছেন! দেখুনতো আপনার অশ্বগুলো আমার খেতের কিরূপ ক্ষতিসাধন করছে!

ব্রাহ্মণের কথায় রাজা তো হতবাক। তিনি সৈন্যদের বললেন খেত থেকে অশ্বগুলো তুলে আনতে। সৈন্যরা তাই করল এবং রাজা চলে যেতে উদ্যত হলেন। এমন সময় ব্রাহ্মণ মাচায় গিয়ে বসে আবার মিনতিভরা কণ্ঠে বলতে লাগলেন: একি মহারাজ! আপনি চলে যাচ্ছেন যে? আপনি না আমার অতিথি? অতিথি বিরূপ হয়ে চলে গেলে আমার অমঙ্গল হবে। আপনি ইচ্ছেমত অশ্বগুলোকে খেতের ফসল খাওয়ান।

রাজা ভোজ এবার বিস্মিত হলেন ব্রাহ্মণের এই অদ্ভুত আচরণ দেখে। ব্রাহ্মণ মাচার উপরে থাকলে একরকম আচরণ করেন, মাচা থেকে নামলে আবার অন্যরূপ ধারণ করেন। তিনি এর রহস্য ভেদ করার জন্য স্বয়ং মাচার উপরে গিয়ে বসলেন। তখন তিনি অনুভব করলেন– তাঁর মধ্যেও এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। তিনিও যেন তাঁর সমস্ত সম্পদ প্রজাদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে পারেন। তিনি বুঝতে পারলেন– এই মাচার নিচে অলৌকিক কিছু একটা আছে। তিনি তখন মাচা থেকে নেমে এসে যথেষ্ট দাম দিয়ে ব্রাহ্মণের কাছ থেকে ঐ জায়গাটি কিনে নিলেন। যথাসময়ে মাটি খুঁড়ে দেখতে পেলেন একটি সিংহাসন। এটিই দেবরাজ প্রদত্ত মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সেই রত্নসিংহাসন। ভোজরাজ যারপরনাই খুশি হলেন। কিন্তু শত চেষ্টা করেও সিংহাসনটি তিনি তুলতে পারলেন না। তারপর মন্ত্রীর পরামর্শে তিনি যথাবিহিত যাগ্যয জ্ঞাদির অনুষ্ঠান করলেন এবং তখন সিংহাসনটি আপনি উঠে এল। রাজা ভোজ অতি যত্নের সঙ্গে সিংহাসনটি রাজধানীতে নিয়ে এলেন। সিংহাসনে বত্রিশটি পুতুলের মূর্তি খোদিত ছিল। রাজা যখন পুতুলগুলোর মাথায় পা রেখে সিংহাসনে বসতে যাচ্ছিলেন, তখন প্রত্যেকটি পুতুল রাজা বিক্রমাদিত্যের শৌর্য্যবীর ́, দয়াদা ৰিণ্য ইত্যাদি সম্পর্কে একেকটি গল্প বলেছিল। এ থেকেই গ্রন্থের নাম হয়েছে দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকা। এতে বত্রিশটি গল্প আছে। বর্তমান কালের পাঠকের উপযোগী করে গল্পগুলো রাজা বিক্রমাদিত্য ও বত্রিশ পুতুলের গল্প নামে নতুনভাবে উপস্থাপিত হল। এ গল্পগুলো পড়লে পাঠকের মধ্যে, বিশেষত শিশুদের মধ্যে মহানুভবতা, পরোপকারিতা, দানশীলতা, ধৈর্য, শৌর্য, বীর্য, ঔদার্য, সাহসিকতা ইত্যাদির মনোভাব সৃষ্টি হবে।

এ পর্যন্ত আমরা দ্বাবিংশতম পুতুলের গল্প শুনেছি। এবার শোনা যাক ত্রয়োবিংশ, চতুর্বিংশ ও পঞ্চবিংশ পুতুলের গল্প:

ত্রয়োবিংশ পুতুলের গল্প

এবার ভোজরাজ ত্রয়োবিংশ পুতুলের মাথায় পা দিয়ে সিংহাসনে বসতে গেলেন। তখন পুতুলটি বলে উঠল: রাজন! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় মহানুভব ও কর্তব্যনিষ্ঠ হন, তাহলে এই সিংহাসনে উপবেশন করুন।

ভোজরাজ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে পুতুলটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। পুতুলটি তখন বলতে লাগল: মহারাজ বিক্রমাদিত্য একবার স্বপ্নে দেখলেন তিনি একটি মহিষের পিঠে চড়ে দক্ষিণ অভিমুখে চলেছেন। পরের দিন রাজসভায় উপস্থিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের কাছে তিনি এই স্বপ্নদর্শনের শুভাশুভ ফল জানতে চাইলেন।

সর্বশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বললেন: মহারাজ! স্বপ্নে হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ, প্রাসাদে আরোহণ, মরণ, রোদন, ব্রাহ্মণ, গঙ্গা, সমুদ্র, সুবর্ণ ও শঙ্খ দর্শনের ফল শুভ হয়ে থাকে। এছাড়া গো, বৃষ, বনস্পতি ও পর্বতারোহণের ফলও শুভ হয়। কিন্তু গর্দভ, মহিষ, কণ্টকময় বৃক্ষে আরোহণ, বানর ও ব্যাঘ্র দর্শনের ফল অশুভ হয়।

মহারাজ বললেন: তাহলে এখন এর প্রতিকার কি?

পণ্ডিতগণ বললেন: আজ সারাদিন উপবাস থেকে রাতে দেবী চণ্ডীর পূজা করুন। পরের দিন পুনরায় দেবীর পূজা দিয়ে তারপর আহার গ্রহণ করুন। তাহলে এই অশুভ কেটে যাবে।

পণ্ডিতদের পরামর্শ অনুযায়ী মহারাজ তাই করলেন। সারাদিন নির্জলা উপবাস থেকে ভক্তিভরে দেবী চণ্ডীর পূজা দিলেন। পরের দিন প্রত্যুষে দেবীর পূজা শেষ হলে মহারানি প্রসাদ ও খাবার নিয়ে এলেন। কিন্তু মহারাজ বললেন: না, প্রতিদিনের মত আজো আগে শিশু, বৃদ্ধ, আতুর, গর্ভিণী ও অতিথিরা ভোজন করবেন; তার পরে আমি খাব।

অথচ তিনি কিন্তু আগের দিন থেকে জল পর্যন্ত স্পর্শ করেননি। তাঁর এই মহানুভবতা দেখে সবাই ধন্যধন্য করতে লাগল।

তাই, হে রাজন! আপনি যদি মহারাজের ন্যায় এরূপ মহানুভব ও কর্তব্যনিষ্ঠ হন, তবেই এই সিংহাসনে বসার অধিকারী হবেন।

পুতুলের কথা শুনে ভোজরাজ নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

চতুর্বিংশ পুতুলের গল্প

ভোজরাজ নীরবে কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। তারপর পুনরায় সিংহাসনে বসার উদ্দেশ্যে পা বাড়ালেন। অমনি চতুর্বিংশ পুত্তলিকা বলে উঠল: হে রাজন! আপনি যদি মহারাজ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় সত্যনিষ্ঠ হন, তাহলে এই দৈব সিংহাসনে আরোহণ করুন।

ভোজরাজ বললেন: মহারাজ বিক্রমাদিত্য কিরকম সত্যনিষ্ঠ ছিলেন?

পুত্তলিকা বলল: শুনুন তাহলে। মহারাজ

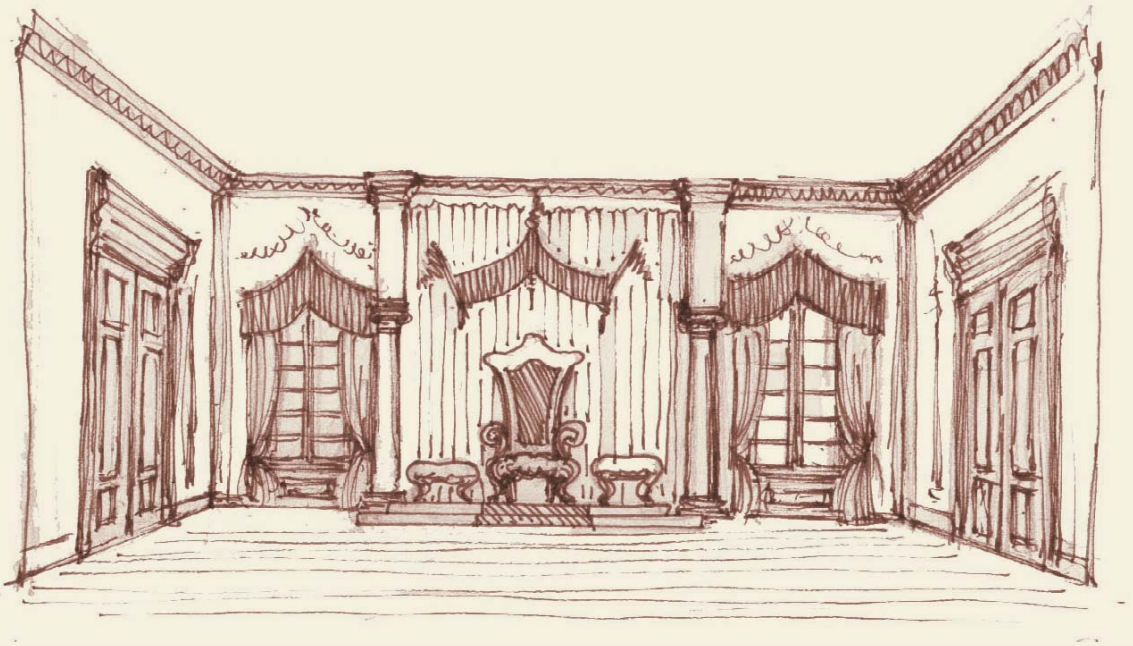

জানতেন প্রতিষ্ঠা নগরের শালিবাহনের হাতে তাঁর মৃত্যু হবে– নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে– নিয়তিকে কে বাধা দিতে পারে? তাই একদিন মহারাজ শালিবাহনকে আমন্ত্রণ জানিয়ে দূত মারফত পত্র পাঠালেন। কিন্তু শালিবাহন ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে বললেন: কে এই বিক্রমাদিত্য? প্রয়োজন হলে তিনি নিজে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

এ কথা শুনে মহারাজ ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। তাঁর ক্রোধাগ্নিতে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। এতবড় ঔদ্ধত্য! রাজার আহ্বান অগ্রাহ্য করে?

মহারাজ অবিলম্বে আট অক্ষৌহিণী সৈন্য পাঠালেন শালিবাহনকে ধরে আনার জন্য। শালিবাহন তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হলে মহারাজ স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হলেন।

শালিবাহন ছিলেন শেষনাগের পুত্র। মায়াবী। তিনি মাটির তৈরি ঘোড়া, হাতি ও সৈন্যদের জীবন দিয়ে মরণপণ যুদ্ধ করতে লাগলেন। কিন্তু মহারাজের পরাক্রমে তিনি পর্যুদস্ত হলেন। নিরুপায় শালিবাহন তখন জীবন রৰায় পিতা শেষনাগকে স্মরণ করলেন। শেষনাগ পুত্রের রক্ষার্থে অনুচর সর্পদের প্রেরণ করলেন। তাদের বিষাক্ত ছোবলে মহারাজের সৈন্যরা নিস্তেজ হয়ে পড়ল। অগত্যা মহারাজ রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করলেন।

রাজধানীতে এসে মহারাজ একাগ্র চিত্তে দেবী চণ্ডীর আরাধনা করতে লাগলেন। তাঁর আরাধনায় তুষ্ট হয়ে দেবী মহারাজকে একটি অমৃতকুম্ভ দান করে বললেন: বৎস! এতে তোমার সৈন্যরা প্রাণ ফিরে পাবে। আর সর্পদষ্ট হয়ে তুমি যদি এর এক বিন্দুও পান কর, তাহলে তোমারও মৃত্যু হবে না।

মহারাজ কৃতজ্ঞচিত্তে সেই অমৃতকুম্ভ গ্রহণ করলেন। এমন সময় এক ব্রাহ্মণ এসে বললেন: মহারাজ! শুনেছি আপনার কাছে কেউ কিছু চাইলে সে খালিহাতে ফেরে না। তাই আমি একটি জিনিস প্রার্থনা করব। যদি প্রতিশ্রুতি দেন তবে চাইব।

মহারাজ বললেন: হে ব্রাহ্মণ! আপনি নিশ্চিন্তে আপনার প্রার্থনা জানাতে পারেন।

ব্রাহ্মণ বললেন: আমি আপনার অমৃতকুম্ভটি প্রার্থনা করছি।

ব্রাহ্মণের প্রার্থনা শুনে মহারাজ চমকে উঠলেন! সবিস্ময়ে কিছুৰণ তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন: হে ব্রাহ্মণ! আপনি নির্দ্বিধায় বলুন কে আপনাকে পাঠিয়েছে?

ব্রাহ্মণ করজোড়ে বললেন: মহারাজ! আমি এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ। অনেক টাকার বিনিময়ে শালিবাহন আমাকে পাঠিয়েছে এই অমৃতকুম্ভটি নেয়ার জন্য।

ব্রাহ্মণের কথা শুনে মহারাজ ভাবলেন: আমি সত্যে আবদ্ধ। তাছাড়া নিয়তির বিধান শালিবাহনের হাতে আমার মৃত্যু হবে। কাজেই এ ব্রাহ্মণের আর অপরাধ কি?

এরূপ চিন্তা করে মহারাজ নিজের নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও প্রসন্নচিত্তে ব্রাহ্মণকে অমৃতকুম্ভটি দিয়ে দিলেন।

পুতুলের মুখে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের এই সত্যনিষ্ঠার কাহিনি শুনে ভোজরাজ নির্বাক দাঁড়িয়ে রইলেন।

পঞ্চবিংশ পুতুলের গল্প

এবার ভোজরাজ পঞ্চবিংশ পুতুলের মাথায় পা দিয়ে সিংহাসনে উঠতে গেলেন। তখন পুতুলটি বলে উঠল: রাজন! মহারাজ বিক্রমাদিত্য খুবই প্রজারঞ্জক ছিলেন। আপনি যদি তাঁর মত হয়ে থাকেন তাহলে এই সিংহাসনে আরোহণ করুন।

ভোজরাজ বিক্রমাদিত্যের প্রজারঞ্জনের ব্যাপারটি জানতে চাইলেন।

পুতুলটি তখন বলতে শুরু করল: একবার মহারাজের রাজত্বকালে ঘোর অনাবৃষ্টি দেখা দিল। একবছর যাবৎ বৃষ্টি হচ্ছে না। খাল্লবিল ফেটে চৌচির। খেতে ফসল নেই। পুকুরে জল নেই। অনাহার আর তৃষ্ণায় ঘরেঘ রে হাহাকার উঠেছে। চারদিকে মহামারী দেখা দিয়েছে। প্রজারা সব খাবার আর জলের জন্য রাজপ্রাসাদে জড় হতে লাগল। সে এক করুণ দৃশ্য!

মহারাজ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে উঠলেন। তিনি তাঁর রাজভাণ্ডার খুলে দিয়েছেন। কিন্তু তাতেও কুলোচ্ছে না। তিনি ব্রাহ্মণপ ণ্ডতদের ডেকে এর বিহিত জানতে চাইলেন। তাঁদের পরামর্শ অনুযায়ী নানারকম যাগ্ন যজ্ঞ করলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হল না।

এমন সময় এক দৈববাণী হল। দ্বাদশ লক্ষণযুক্ত কোন মহান ব্যক্তি যদি নিজের রক্ত দিয়ে রাজলক্ষ্মী জগদম্বার পূজা দেয়, তাহলে এই বিপদ কেটে যাবে।

মহারাজ ছিলেন বত্রিশ লক্ষণযুক্ত। দৈববাণী শুনে তৎৰণাৎ তিনি তরবারি হাতে চললেন দেবী জগদম্বার মন্দিরের দিকে। রাজপরিবারের সবাই তাঁকে নিষেধ করল। কিন্তু তিনি অবিচল। রোরুদ্যমান সকলে তাঁর পশ্চাতে ধাবমান।

মহারাজ মন্দিরে ঢুকে ভক্তিভরে দেবীকে প্রণাম করলেন। তারপর তরবারি দিয়ে নিজের কণ্ঠ ছেদন করতে উদ্যত হলেন। এমন সময় দেবী জগদম্বা আবির্ভূত হয়ে মহারাজের হাত ধরে বললেন: বৎস! নিরস্ত হও। তোমার আর আত্মোৎসর্গের প্রয়োজন নেই। প্রজাদের প্রতি তোমার ভালবাসা দেখে আমি প্রসন্ন হয়েছি। অবিলম্বে তোমার রাজ্য আবার সুখশান্তিতে ভরে উঠবে।

এই বলে দেবী অন্তর্হিত হলেন। আর মুহূর্তের মধ্যেই মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল। দেখতে দেখতে খাল্লবিল জ লে ভরে উঠল। খেতে ফসল ফলল। রাজ্যের সকলের মুখে হাসি ফুটল। সবাই মহারাজকে ধন্যধন্য করতে লাগল।

পুতুলের মুখে বিক্রমাদিত্যের প্রজারঞ্জনের এই কাহিনি শুনে ভোজরাজ বাক্‌রুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

● পরবর্তী সংখ্যায়

ড. দুলাল ভৌমিক
শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

Saffola Active

Introducing new 'Saffola Active', blended edible vegetable oil. It brings you the benefits of 2 oils (80% Rice Bran & 20% Soyabean) in one. Saffola Active is more effective for heart than any other ordinary vegetable oil. And it promises you healthy heart and healthy life.

Triple Action — Omega3, Vitamin E, Oryzanol

Saffola Active is enriched with **Triple Action Formula** that contains the goodness of Omega 3, Oryzanol and Vitamin E which help to reduce LDL (bad cholesterol) levels.

LOSORB™ TECHNOLOGY

Saffola Active comes with patented **LOSORB technology**. Foods cooked in Saffola Active have lower fats due to lower absorption of oils while cooking.

5 Antioxidant

Saffola Active also has the **goodness of 5 antioxidants** which keeps your heart and life healthy.

So, start using Saffola Active from today and keep your family healthy and always rejuvenized. Available in 1 litre and 5 litres jars.

marico

Healthy Heart
Healthy Life

সংস্কৃতি

ত্রিপুরার বাচিক উৎসবে সৌহার্দের সুর

লায়লা আফরোজ

আজ থেকে বহুযুগ আগে, ১৯৬৬ সালে কবি অচিন্ত্যকুমার সেন 'পুব-পশ্চিম' শিরোনামে একটি অমর কবিতা লিখেছেন। সেই কবিতায়, ভারত এবং বাংলাদেশ এই দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মানুষের অর্থাৎ দুই বাংলার বাঙালিদের মধ্যে বিরাজমান অবিভেদ্য আত্মিক-সম্পর্কের কথা বলতে গিয়ে কবি লিখেছেন–

তোমার শীতলক্ষ্যা আর আমার ময়ূরাক্ষী
তোমার ভৈরব আর আমার রূপনারায়ণ
তোমার কর্ণফুলি আর আমার শিলাবতী
তোমার পায়রা আর আমার পিয়ালী
এক জল এক ঢেউ এক ধারা
... ...
আমাদের এক সুখ এক কান্না এক পিপাসা
ভূগোলে ইতিহাসে আমরা এক
এক মন এক মানুষ এক মাটি এক মমতা
পরস্পর আমরা পর নই, আমরা পড়শী
আমাদের এক রবীন্দ্রনাথ এক নজরুল
আমরা ভাষায় এক ভালবাসায় এক মানবতায় এক
বিনা সুতোয় রাখীবন্ধনের কারিগর
আমরা একে অন্যের হৃদয়ের অনুবাদ
মর্মের মধুকর, মঙ্গলের দূত
আমরাই চিরন্তন কুশলসাধক।

অচিন্ত্যকুমার সেনের 'পুব-পশ্চিম' শীর্ষক ক্ল্যাসিক কবিতায় পূর্ব বাংলার বাঙালিদের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিদের আবেগ ও আকুলতা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে আজো সেই আবেগ ও আকুলতার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। কেবল পশ্চিমবঙ্গই নয়, বাংলাদেশ ও ভারতের প্রতিটি সীমান্তবর্তী এলাকা যেসব এলাকায় বাংলা-ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী রয়েছে সর্বত্রই পরস্পরের প্রতি অচিন্ত্যকুমার সেনের কবিতায় বর্ণিত সেই আবেগ অনুভূতি ভাললাগা ভালবাসা এবং হাহাকার সমান্তরালভাবে বহমান।

সম্প্রতি ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় রাজ্য ত্রিপুরার আগরতলায় ১০ ও ১১ আগস্ট অনুষ্ঠিত 'ভারত-বাংলাদেশ বাচিক উৎসব-২০১৫'-য় অংশগ্রহণ করতে গিয়ে আরো একবার এই সত্যেরই প্রমাণ

পাওয়া গেল। উৎসবের আয়োজক আগরতলার প্রখ্যাত আবৃত্তি সংগঠন *শ্রুতি*। *শ্রুতি*র কর্ণধার স্বনামধন্য আবৃত্তিকার শ্রীমতী সুস্মিতা ভট্টাচার্য এবং আবৃত্তিপ্রেমী শ্রী পারিজাত দত্তের আন্তরিক আহ্বানে সাড়া দিয়ে ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং ব্রাহ্মণবাড়ীয়া থেকে যথাক্রমে আমি, রাশেদ হাসান, মনিরুল ইসলাম, রোকেয়া দস্তগীর এবং বাসির দুলাল এই উৎসবে অংশগ্রহণ করি।

১০ আগস্ট ২০১৫ সন্ধ্যায় আগরতলার দৃষ্টিনন্দন 'রবীন্দ্রশতবার্ষিকী ভবনে' উৎসবটি দ্বোধনের দিন উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা শ্রী মানিক সরকার। আগরতলা পৌরনিগ মের মেয়র শ্রী প্রফুলজিৎ সিনহার সভাপতিত্বে এবং *শ্রুতি*র সমন্বয়ক স্মিতা ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী শ্রী ভানুলাল সাহা, ত্রিপুরা বিধানসভার ডেপুটি-স্পিকার শ্রী পবিত্র কর, ডেপুটি মেয়র এএমসি সমর চক্রবর্তী, ভারতীয় সংস্থা ও এমজিসির এ্যাসেট ম্যানেজার শ্রী এস সি সোনি এবং 'ত্রিপুরা স্টেট কোঅপা রেটিভ আরবান ব্যাংক লিমিটেডের চেয়ারম্যান শ্রী শংকর বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলপ্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্যে দিয়ে দু'দিনব্যাপী এই উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী মানিক সরকার। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি ভারত ও বাংলাদেশের সমবেত আবৃত্তিকারদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের রয়েছে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক কিন্তু ত্রিপুরার সঙ্গে বাংলাদেশের রয়েছে অন্য এক আত্মিক সম্পর্ক।' দু'দেশের সংস্কৃতিকর্মীদের মধ্যে ভাব ও সাংস্কৃতিকবিনিময় বাড়ানোর ওপর আরো জোর দিতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

ত্রিপুরার বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর বাচিক শিল্পীরা নিজ নিজ ট্র্যাইবাল-পোশাকে সজ্জিত হয়ে উৎসবের উদ্বোধনীপর্বে অংশগ্রহণ করেন। ফলে উৎসবটি আলো ঝলমল এবং বর্ণিল হয়ে ওঠে। উদ্বোধনীপর্বে চাকমা, মণিপুরী, টিপরা, মগ এবং বাঙালি বাচিকশিল্পীদের বাংলা ও কক্‌বরক ভাষায় পরিবেশিত সম্মেলক কবিতা আবৃত্তি পরিবেশন অনুষ্ঠানে অন্য এক মাত্রা যোগ করে।

দু'দিনব্যাপী এই উৎসবকে আরো মহিমান্বিত করে তোলে ত্রিপুরার বিভিন্ন আবৃত্তি সংগঠন, স্থানীয় কবি ও আবৃত্তিকার, অধ্যাপক, চিকিৎসক এবং চিত্রকদের সরব উপস্থিতি। উৎসবে অংশগ্রহণকারী কবিআবৃত্তিকার ও চিত্রকরেরা হলেন যথাক্রমে কে সারিতা সিংহ, বৈশম্পায়ন চক্রবর্তী, পিনাকপাণি দেব, দিলীপ দাস, পিন্টুলাল সাহা, পারিজাত দত্ত, উত্তম চক্রবর্তী, অধ্যাপক মোজাহিদ রহমান, সুমন ভট্টাচার্য, দীপক সাহা, চিন্ময় রয়, শুভ্রা ধর, ড. নীলমণি দেববর্মণ, কারারি মগচৌধুরী, পদ্মাবতী সিনহা এবং *শ্রুতি*র ক্ষুদে শিল্পীরা। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় যৌথভাবে ছিল ভারতীয় সংস্থা ওএনজিসি এবং বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী 'প্রাণআরএফএল গ্রুপ'এর পানীয় 'প্রাণ ফ্রুটো'।

১৯৭১ সালে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ত্রিপুরা ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র। এখানে গড়ে উঠেছিল আহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য হাসপাতাল, আশ্রয় শিবির ও গেরিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। অসংখ্য আগরতলাবাসী আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র অংশগ্রহণ করেন। সেই স্মৃতিকে স্মরণ করে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার ২০০১ সালের ১০১৪ জানুয়ারি আগরতলায় প্রথম মুক্তিযুদ্ধ উৎসবের আয়োজন করে। সেই উৎসবে বাংলাদেশ থেকে মুক্তিযোদ্ধা, সাংস্কৃতিক কর্মী, রাজনৈতিক নেতা, পূর্ণমন্ত্রী ও সাংবাদিকসহ মোট ১১০জনের এক বিশাল প্রতিনিধি দল যোগ দেন। আমন্ত্রিত আবৃত্তিকার হিসেবে আমারও সেই উৎসবে অংশগ্রহণের দুর্লভ সুযোগ ঘটেছিল। সেবার উৎসবের শেষদিন দু'দলে ভাগ করে আমাদের বিভিন্ন দ্রষ্টব্যস্থান দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়। আমরা বেছে নিয়েছিলাম কমলারদিঘি এবং মেলাঘর রুট। তখন ভারতের এ অঞ্চল বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গিআ ক্রমণে প্রায় বিপযস্ত। আমরা যারা রাষ্ট্রীয় অতিথি ছিলাম তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ত্রিপুরা সরকার সেবার যে নিশ্ছিদ্রনিরাপ ত্তার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, তা মনে রাখার মত। হোটেলের লবি, সিঁড়ি, ডায়নিং-স্পেস সর্বত্র চার হাত দূরত্বের ব্যবধানে দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন করে 'বম্যাকক ্যাট' সদস্য। এমন কি, এক থানার সীমানা শেষ করে অন্য থানায় প্রবেশের মুহূর্তে আমাদের হ্যান্ডওভার-টেকওভার করেছিলেন স্থানীয় থানার অফিসার ইনচার্জ!

সেই প্রথম দেখা আগরতলার সঙ্গে। ১৩বছর পর দেখা আগরতলার আকাশপাতাল তফাৎ। উন্নয়নের কী নীরব বিপস্নব সেখানে ঘটে গেছে তা চোখে না দেখলে অনুমান করা অসম্ভব। আমাদের এত কাছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের যে এমন একটি সুসভ্য সুশিক্ষিত এবং সুশৃঙ্খল একটি রাজ্য রয়েছে, যিনি ত্রিপুরায় যাননি, তাকে সহজে বোঝানো যাবে না। জয় হোক ত্রিপুরার, জয় হোক ত্রিপুরার মানুষের, জয় হোক আবৃত্তির। আবৃত্তির দিগন্ত সম্প্রসারিত হোক। ভারতবাংলা দেশ সৌহার্দ চিরকাল অটুট থাকুক।

লায়লা আফরোজ অভিনয় ও আবৃত্তিশিল্পী

শুভ্রা মুখোপাধ্যায়
বাংলার অনন্য আত্মীয়

আবু ফরহাদ

বাংলাদেশের নড়াইলের ভদ্রবিলা গ্রামের মেয়ে ভারতের ফার্স্ট লেডি শুভ্রা মুখোপাধ্যায় আজ পরলোকে। তাঁর মৃত্যুতে বাংলাদেশ এক অকৃত্রিম বন্ধুকে হারালো। আমরা হারালাম আমাদের একান্ত এক স্বজনকে। তাঁর মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকাহত।

বাংলাদেশের একান্ত সুহৃদ, বড় আপনজন শুভ্রা মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯৪৩ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর, নড়াইল শহরের দক্ষিণে নিভৃত ভদ্রবিলা গ্রামে। বাবা অমরেন্দ্র ঘোষ ছিলেন জমিদার। মা মীরারানী ঘোষ।

রবীন্দ্র সাহিত্যানুরাগী বিদূষী এই মহিলা নিজে ছিলেন রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী। একনিষ্ঠভাবে শুধু চর্চা নয়, রবীন্দ্রনাথের গান পরিবেশন করেছেন ভারত এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। রবীন্দ্রনৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ করেছেন নিয়মিত। *গীতাঞ্জলি* নামে একটি গানের দল করেছেন। এই দলের হয়ে ও ভারত এবং পৃথিবীর নানা দেশে পরিবেশন করেছেন রবীন্দ্রসংগীত ও রবীন্দ্র নৃত্যনাট্য। পুরোদস্তুর সংস্কৃতিসেবী শুভ্রা মুখোপাধ্যায় ছিলেন উঁচু মাপের চিত্রশিল্পীও। একক ও যৌথ নানা চিত্র প্রদর্শনীতে তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বিভিন্ন সময়ে সাক্ষাতের স্মৃতি নিয়ে রচনা করেছেন একটি সুখপাঠ্য স্মৃতিকথা *চোখের আলোয়*। চিন ভ্রমণ নিয়ে রচনা করেছেন একটি মনোজ্ঞ ভ্রমণকাহিনি *চেনা অচেনায় চীন*। সঙ্গীত ও চিত্রশিল্পী সুসাহিত্যিক শুভ্রা মুখোপাধ্যায় ছিলেন সমাজহিতৈষী ও নান্দনিকতায় অভিযাত্রী মানুষ, একজন সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালি।

নড়াইলের এই শিল্প ও সাহিত্যানুরাগী মানবী ছিলেন বাংলাদেশের প্রতি স্মৃতিকাতর ও মমতাময়ী। বাংলাদেশের আপনজন। বিভিন্ন সময় নিজ জন্মভূমিতে, শৈশব কৈশোরের গ্রামে বেড়াতে এসেছেন। দেশের মানুষ, আপনজনদের কখনো ভুলতে পারেননি।

শুভ্রা মুখোপাধ্যায়ের ভাই কানাইলাল ঘোষ যশোরের ডিজিটাল পত্রিকা *যশোরডটইনফো*কে একান্ত আলাপচারিতায় জানান, '...দিদি (শুভ্রা মুখোপাধ্যায়) এসেছিলেন ১৯৯৫ সালে। শুভ্রা মুখোপাধ্যায় এখন আর বাংলাদেশের নাগরিক নন। তারপরও তিনি মনে রেখেছেন তাঁর গ্রাম নড়াইলের ভদ্রবিলাকে। এত দিন পর নিজ ভিটেয় এসে দিদির সে কি উচ্ছ্বাস! এই মাটি, এই ঘর, এই চিত্রা নদী। দিদি তো এখানে কৈশোর কাটিয়েছেন। তাই এই মাটির প্রতি তাঁর আলাদা টান রয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'এখনও নিয়মিত খোঁজখবর রাখেন দিদি। খোঁজ নেন দাদাবাবুও (প্রণব মুখোপাধ্যায়)। আমাদের দেশের আম আর ইলিশ মাছ দাদাবাবুর খুব প্রিয়। প্রেসিডেন্ট হলেও তিনি অত্যন্ত সাদাসিধে বাঙালি। আমরা তাঁর জন্য গর্ববোধ করি।' ১৯৯৫ সালে শুভ্রা মুখোপাধ্যায়ের নড়াইলের ভদ্রবিলা গ্রামে বেড়াতে আসার স্মৃতি রোমন্থন করে *যশোরডটইনফো* পত্রিকা আরো জানায়, 'চিত্রা নদীর ধারে ছবির মতন সাজানো গোছানো গ্রামে পা রেখে শুভ্রা মুখোপাধ্যায় আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তাঁর পিতার কাছারি বাড়িতে এখন তহসীল অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয় ও একটি পোস্ট অফিস। বাড়িসংলগ্ন ঐতিহ্যবাহী শ্রীকৃষ্ণের মন্দির। বাড়ি এলে শুভ্রা মুখোপাধ্যায়কে এলাকার অগণিত নারীপুরুষ স্বাগত জানান। পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তাঁকে বরণ করে নেন। শৈশবের স্মৃতিঘেরা নদীর তীর, প্রাচীন বৃক্ষগুলো গভীর আবেগ আপন মমতা দিয়ে স্পর্শ করেন তিনি। *যশোরডটইনফো* পত্রিকা আরো জানায়, 'শুভ্রা মুখোপাধ্যায় শৈশবে কিছুদিন ছিলেন মামাবাড়ি নড়াইল সদরের তুলারামপুর গ্রামে। তাঁর দুই মামা নিশিকান্ত ও হরিপদ ঘোষ। মামাতো দাদারা এখনও ওই গাঁয়ে থাকেন। তুলারামপুর কাজলা নদীর তীরঘেঁষে একটি সমৃদ্ধ জনপদ। পাশেই চাঁচড়া গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তিনি লেখাপড়া করেছেন। কিছুদিন পড়েছেন তুলারামপুর বালিকা বিদ্যালয়ে। তাঁর মায়ের জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই বিদ্যালয়ে এলে উপস্থিত শিক্ষকুশি ক্ষার্থীরা তাঁকে স্বাগত জানান। তিনি সেখানে ১০ হাজার টাকা অনুদান দেন। দেশভাগের পর ১৯৫৫ সালে তাঁরা ভারতে চলে যান। ৪০ বছর পর তিনি নড়াইলে এলে তাঁকে এক নজর দেখার জন্য মানুষ স্কুলপ্রাঙ্গণে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। চাঁচড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনের একটি অংশের ছাদ ধসে পড়েছে। এলাকাবাসী তাঁর কাছে সেটি দ্রুত মেরামতের দাবি জানান। নড়াইলের কার্তিক ঘোষ সম্পর্কে শুভ্রা মুখোপাধ্যায়ের পিসতুতো দাদা। কার্তিক ঘোষ জানান, এখনও আমাদের সঙ্গে শুভ্রা মুখোপাধ্যায়ের নিয়মিত যোগাযোগ হয়।'

বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শুভ্রা মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁর শোকবার্তায় বলেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী শুভ্রা মুখোপাধ্যায়ের প্রয়াণে বাংলাদেশ একজন মহান বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষীকে হারালো। প্রধানমন্ত্রী ভারতের রাষ্ট্রপতিকে প্রেরিত বার্তায় আরো বলেন, 'আমরা গর্বিত যে তিনি বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছেন। বাংলাদেশের জন্য তাঁর ভালবাসা ও মমতার কথা প্রীতির সঙ্গে স্মরণ করছি।' প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, 'আমি আপনার সহধর্মিণী ও ভারতের ফার্স্ট লেডি শ্রীমতী শুভ্রা মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ এবং আমার নিজের পৰ থেকে আপনাকে এবং আপনার পরিবারকে গভীর শোক জ্ঞাপন করছি।' শুভ্রা মুখোপাধ্যায়কে একজন মর্যাদাশীল মহিলা, স্নেহময়ী মা, একজন পতিব্রতা স্ত্রী এবং একজন অনন্যা নারী হিসেবে অভিহিত করে শেখ হাসিনা বলেন, 'তিনি শিল্প ও সংস্কৃতির অনুরাগী এবং একজন প্রতিভাধর চিত্রশিল্পী ছিলেন। আমরা আপনার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও আপনার রাজনৈতিক জীবনে তাঁর প্রভূত ভূমিকা সম্পর্কে অবগত আছি।' মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, 'এই শোকের সময় এই অপূরণীয় ক্ষতি বহনে আপনার ও আপনার শোকসন্তপ্ত পরিবারের সাহস ও ধৈর্য্যের জন্য দোয়া করছি।' বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাঁর শেষকৃত্যে অংশগ্রহণ করতে দিল্লি ছুটে যান।

আমরা বাংলাদেশের আপামর জনগণ শুভ্রা মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারপরিজ নের প্রতি গভীর সমবেদনা ও আন্তরিক শোক জ্ঞাপন করছি।

আবু ফরহাদ শিল্পবোদ্ধা, ব্যাংকার

ঢাকায় আইজিসিসি মিলনায়তনে আগস্টে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালা

সত্যমেব জয়তে

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

ঢাকার ধানমন্ডিতে নতুন আইভিএসি কেন্দ্র

ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি)-এর মাধ্যমে ভারতীয় ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্য ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার স্বীকৃত এজেন্ট এস্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) আনন্দের সঙ্গে ১জানুয়ারি, ২০১৫ বৃহস্পতিবার থেকে ভিসার আবেদনপত্র গ্রহণ ও বিতরণের জন্য ঢাকায় একটি নতুন আইভিএসি সুবিধাদানের ঘোষণা দিচ্ছে।

ঠিকানা

আইভিএসি কেন্দ্র, বাড়ি ২৪, সড়ক ২, ধানমন্ডি, ঢাকা ১২০৫

কার্যক্রমকাল

রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র গ্রহণ সকাল ৮.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা।

রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র বিতরণ বিকাল ৩.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা।

আইভিএসি-র সব কেন্দ্রে সব ধরনের ভিসা আবেদন গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে এখন নিম্নোক্ত আইভিএসি কেন্দ্র বিদ্যমান। এগুলি হচ্ছে: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা ॥ আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা ॥ আইভিএসি, ধানমন্ডি, ঢাকা (নতুন) ॥ আইভিএসি, চট্টগ্রাম ॥ আইভিএসি, সিলেট আইভিএসি, খুলনা ॥ আইভিএসি, রাজশাহী।

ভিসা আবেদন করার সময় আবেদনকারীদের সঠিক বিভাগ নির্ধারণ করে আবেদন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সব দলিল সঠিক, সম্পূর্ণ ও অবিকল হওয়া চাই। আবেদনকারীদের এজেন্ট ও মধ্যবর্তী মানুষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার এবং এসব ক্ষেত্রে নিকটতম থানা/আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আইভিএসি বাংলাদেশে তার পক্ষে কাজ করার জন্য কোন ব্যক্তি/সংস্থাকে অনুমোদন দেয়নি।

পুনর্নির্ধারিত প্রক্রিয়া ফি

০১.০১.২০১৫ থেকে পুনর্নির্ধারিত ভিসা প্রক্রিয়া ফি নিম্নোক্ত হারে কার্যকর হবে:

১. ঢাকার সব আইভিএসি কেন্দ্র– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ২. আইভিএসি, চট্টগ্রাম– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রাজশাহী– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৪. আইভিএসি, সিলেট– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৫. আইভিএসি, খুলনা– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০।

আলোকচিত্র আপলোডের নতুন পদ্ধতি:

০১.০১.২০১৫ থেকে বিশেষভাবে কার্যকর, আবেদনকারীদের অনলাইন আবেদনপত্রে দেওয়া নির্ধারিত জায়গায় তাদের আলোকচিত্র স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। স্ক্যানকৃত আলোকচিত্র ছাড়া আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

মেডিক্যাল ভিসা

আইভিএসি, গুলশান কেন্দ্রে একটি বিশেষ মেডিক্যাল এমারজেন্সি ভিসা কাউন্টার রয়েছে। ই-টোকেন ছাড়াও আইভিএসি, গুলশান কেন্দ্রে আগে এলে আগে পাবেন ভিত্তিতে মেডিক্যাল এমারজেন্সি ভিসা আবেদন জমা দেওয়া যাবে।

হেল্পলাইনসমূহ

হেল্পলাইন টেলিফোন/ ফ্যাক্স/ ই-মেইলসমূহ: ০০-৮৮-০২ ৮৮৩৩৬৩২২ ॥ ০০-৮৮-০২ ৯৮৯৩০০৬ ॥ ০০-৮৮-০১৭১৩ ৩৮৯৪৯৯ ০০-৮৮-০২ ৯৮৬৩২২৯ (ফ্যাক্স) ॥ visahelp@ivacbd.com. আরো সাহায্যের জন্য ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in

ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যে-কোন ধরনের প্রশ্নের জবাব পেতে ভিজিট করুন: http://www.ivacbd.com/faq.php

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত